

বাঙলার ডাকাত

প্রকাশক ঃ
শ্রীরবীন বল
শৈব্যা পুস্তকালয়
৮/১ বি, শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৭০০০৭৩

প্রচ্ছদ শিল্পী ঃ গৌতম রায়
চিত্র শিল্পী ঃ রঞ্জিত দাস

শৈব্যা (নূতন)
তৃতীয় সংস্করণ ঃ
৭ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৫৮

মুদ্রাকর ঃ
রণজিৎকুমার মণ্ডল
লক্ষ্মীজনার্দন প্রেস
৬, শিবুবিশ্বাস লেন
কলিকাতা-৬

‘বাংলার ডাকাত’ দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশিত হইল। ‘শিশুসাথী’তে মাসের পর মাস ডাকাতের গল্প প্রকাশিত হয়েছে। এক মাসের জন্য কোন কারণে ‘শিশুসাথীতে’ উহার প্রকাশ বন্ধ থাকিলে সম্পাদক মহাশয় তাগাদার পর তাগাদা দিয়া আমাকে ব্যস্ত করিয়া তুলিলেন। ইহাতে মনে হয় আমার তরুণ-বন্ধুদের কাছে ডাকাতের গল্পের একটা অতিরিক্ত আকর্ষণ আছে। ইতিহাস, সরকারী প্রাচীন দলিল-পত্র, বিভিন্ন জেলার ম্যাজিষ্ট্রেট-কালেক্টর, রাজকর্মচারী এবং দারোগা-পুলিশের বিবরণী হইতে সত্য বিবরণ সংগ্রহ করিয়া প্রকাশ করিয়াছি। সকলের কাছেই এই দুরন্ত ও দুর্ধর্ষ ডাকাতের গল্প ভাল লাগিয়াছে, কাজেই দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশ করিলাম। আশা করি আমার প্রিয় বালক ও কিশোর বন্ধুরা প্রথম খণ্ডের মত দ্বিতীয় খণ্ড ‘বাংলার ডাকাত’ বইটিকে পরম সমাদরে গ্রহণ করিবে।

কলকাতা

শ্রীযোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত

সূচী



বীরাঙ্গনা দয়াময়ী

এক

কে না জানে বাংলার বীর সন্তান সীতারামের নাম? তিনি অপূর্ব বীরত্বের সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া স্বাধীন রাজ্য স্থাপন করিয়াছিলেন। সীতারাম ছিলেন ঐতিহাসিক ব্যক্তি। তাঁহার কথা তোমরা ইতিহাসে নিশ্চয়ই পড়িয়াছ। এখানে সীতারামের কথা আমরা বলিব না, বলিব তাঁহার মায়ের কথা - বীরাঙ্গনা দয়াময়ীর বীরত্বের কাহিনী।

যশোহর জেলার মধুমতী নদীর তীরে শ্যামপুর গ্রাম। সেই গ্রামে বাস করিতেন উদয়নারায়ণ রায়। রায়মহাশয় ছিলেন জমিদার। তাঁহার পূর্বপুরুষের সংগৃহীত বহু অর্থ ছিল। নিজের চেষ্টা ও যত্নবলে তিনি বহু জমিজমা করিয়া বেশ প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিলেন। শ্যামপুর গ্রামের এক প্রান্তে ছিল তাঁহার বাড়ী। চারিদিক বনজঙ্গলে ঘেরা, গভীর বাঁশবন, অশ্বত্থ, বট, পাকুড়, দেবদারু, সপ্তপর্ণ প্রভৃতি নানা জাতীয় গাছে ঢাকা। এক দীঘির পাড়ে ছিল উদয়নারায়ণের প্রকাণ্ড বাড়ী। সেইটি ছিল বৃহৎ চক্‌মিলান বাড়ী। লোকজন সদাসর্বদা ঘিস্‌ঘিস্‌ করিত। আত্মীয়-স্বজন-পরিবৃত শক্তিশালী উদয়নারায়ণকে সকলে শ্রদ্ধা ও ভক্তি করিত। অসাধারণ বুদ্ধিমান যোদ্ধা এবং সাহসী ছিলেন উদয়নারায়ণ। লাঠি খেলিতে, ঘোড়ায় চড়িতে, তলোয়ার ধরিতে তাঁহার সমকক্ষ বীর বড় একটা দেখা যাইত না। তাঁহার হাঁক-ডাকে দশখানি গ্রামের লোক তাঁহাকে মাতব্বর বলিয়া মানিত। এই বীর উদয়নারায়ণের পত্নীর নাম দয়াময়ী। তাঁহার কথাই আজ বলিব। উদয়নারায়ণ রায় ছিলেন উত্তররাঢ়ীয় কায়স্থ।

সপ্তদশ শতাব্দীতেও বাংলাদেশের অবস্থা বিশেষ সুবিধাজনক ছিল

না। চোর-দস্যু-ডাকাতের উপদ্রব ছিল অত্যন্ত বেশী। তখন চলিত কথা ছিল, 'যার লাঠি তার মাটি'। প্রত্যেক জমিদার বাড়ীতে থাকিত বরকন্দাজ। যে-কোন ধনী ব্যক্তি তাঁহার বাড়ীঘর রক্ষার জন্য বাড়ীতে বরকন্দাজ রাখিতেন এবং তাহাদের লাঠির জোরে জমি দখল করিতেন, দস্যু-ডাকাত দমন করিতেন। লাঠির ঘায়ে তরবারি টুকরা টুকরা হইয়া যাইত। লাঠি চালনায় দক্ষ বীরের হাতে পড়িলে বন্দুক ও সঙ্গীন পর্যন্ত যোদ্ধার হাত হইতে খসিয়া পড়িয়াছে। যোদ্ধা ভাঙা হাত লইয়া পলাইয়াছে। লাঠি সেকালের বাংলার আব্রু-পরদা রাখিত, ধন রাখিত, জন রাখিত, সবার মান রাখিত। মুসলমান তোমার ভয়ে ত্রস্ত ছিল, ডাকাত তোমার জ্বালায় ব্যস্ত ছিল, নীলকর তোমার ভয়ে নিরস্ত ছিল। একথা সেকালে ছিল সত্য। একালেও একদিন লাঠির প্রতাপ বড় কম ছিল না।

সেকালে পুরুষদের মত সম্ভ্রান্ত ঘরের মেয়েরাও লাঠি ধরিতে, তলোয়ার চালাইতে, বর্শা ছুঁড়িয়া মারিতে শিক্ষা করিতেন। না করিয়া উপায়ও ছিল না। কখন ডাকাত পড়ে, কখন পর্তুগীজ ফিরিঙ্গীরা গ্রাম লুঠ করে, তাহার ত ঠিক ছিল না। এজন্য লোকে সর্বদা ভয়ে ভয়ে থাকিত এবং সতর্ক থাকিত—সকলে লড়িত। তখনকার দিনে মধুমতী শ্যামপুকুরের প্রান্তবাহিনী নদী প্রবলবেগে বহিয়া যাইত। সেই নদীর স্রোতে উজান ও ভাঁটি বুঝিয়া দস্যুরা এক এক গ্রামে আসিয়া পড়িত এবং লুঠতরাজ আর রাহাজানি করিয়া পলাইত। ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের চুরি করিয়া বিক্রয় করিত। এই দস্যু-ডাকাতেরা ছিল ফিরিঙ্গী হারমাদের দল। কাজেই সেকালের তালুকদার ও জমিদারেরা আত্মরক্ষার জন্য সর্বদা প্রস্তুত থাকিতেন ভাবী বিপদের আশংকায়।

দুই

সেকালে রহিম খাঁ পাঠান যশোহর জেলার একজন বিখ্যাত দস্যু ছিল। তাহার দলে হিন্দু ছিল, মুসলমান ছিল, হিন্দুস্থানী, ভোজপুরী, ফিরিঙ্গী, সব জাতির এবং সব দেশের লোক ছিল। রহিম খাঁ দীর্ঘকায়, বলিষ্ঠ এবং রণনিপুণ ব্যক্তি ছিল। সে ছিল আফগান

সৈনিক, নবাবের ফৌজ ; কিন্তু গোপনে দস্যুবৃত্তি করিত। একথা জানাজানি হইলে তাহাকে নবাব-সরকার হইতে তাড়াইয়া দেওয়া হয়। রহিম তাহাতে দমিল না। সে পুনরায় আরম্ভ করিল দস্যুবৃত্তি। দলে লোক জুটিল। নিবিড় বনে নানা স্থানে নানা জেলায় ছিল তাহাদের আড্ডা। এখনও দিনাজপুরে, রংপুরে, ভাওয়ালের নিবিড় জঙ্গলে, ময়মনসিংহের নানা স্থানের বনভূমিতে তাহাদের ভগ্ন জীর্ণ অট্টালিকার ধ্বংসাবশেষ দেখা যায়। এই সব ডাকাত-দলের মধ্যে একটা বিষয় লক্ষ্য করবার ছিল এই যে, তাহাদের মধ্যে কোনরূপ জাতিভেদ বা দলাদলি ছিল না। হিন্দু-মুসলমান ভেদ ছিল না। সকলেই ছিল মা ভবানীর উপাসক। মা কালী ছিলেন তাহাদের আরাধ্যা দেবী। নরবলি দিয়া মায়ের পূজা করা ডাকাতির প্রথা ছিল। তোমাদের কাছে আগেও সেকথা বলিয়াছি। এই যে রহিম খাঁর কথা বলিলাম—এই খাঁ সাহেব উদয়নারায়ণকে দেখিতে পারিত না। তাহার কারণ ছিল—উদয়নারায়ণ কয়েকবার রহিম খাঁর দলকে জব্দ করিয়া দিয়াছেন। পাঠান রহিম খাঁ প্রতিশোধের সন্ধান করিতেছিল। উদয়নারায়ণের ভয়ে সে শ্যামপুরের আশেপাশের গাঁয়ে ডাকাতি করিতে পারে নাই।

একবার উদয়নারায়ণ দূর গাঁয়ে তাঁহার কাছারি-বাড়ী গিয়াছেন খাজনা ও অন্যান্য বিষয়ের খোঁজখবর করিতে। বাড়ীতে অল্পসংখ্যক বরকন্দাজ আর শিশু পুত্রকন্যা লইয়া রহিলেন পত্নী দয়াময়ী। এ সংবাদ রহিম খাঁর দলের অজানা ছিল না। তাহারা জানিতে পারিল—উদয়নারায়ণের দেশে ফিরিতে প্রায় দুই-তিন মাস বিলম্ব হইবে। মহা-উৎসাহে মাতিয়া উঠিল দস্যুদল। এমন সুযোগ কি ছাড়া যায়!

তিন

সেইদিন কৃষ্ণা চতুর্দশী। রাত্রি গভীর অন্ধকার। শ্যামপুর পল্লী নীরব নিস্তব্ধ। মাঝে মাঝে শিয়াল ডাকিতেছে। কুকুরেরা কোন গৃহস্থ-বাড়ীর ঢেঁকিশাল হইতে ঘেউ-ঘেউ শব্দ করিতেছে। কোন গৃহস্থের ঘরে বেড়ার ফাঁক হইতে প্রদীপের ক্ষীণ-রশ্মি দেখা

যাইতেছে। চারদিকের বনজঙ্গল, শিমূল, সপ্তপর্ণ, বট, অশ্বত্থ সব গাছ দৈত্যদানার মত মাথা তুলিয়া দাঁড়াইয়া আছে।

দস্যুদল একটা খালের ধার দিয়া চলিল উদয়নারায়ণের বাড়ী। বাড়ীর চারিদিকে বেড়িয়া গভীর পরিখা। জল থৈ-থৈ করিতেছে। পরিখার পরে বাড়ীর চারিদিক বেড়িয়া প্রাচীর। শুধু সম্মুখের দিক্ দিয়া একটা প্রকাণ্ড পথ বাড়ীর তোরণ পর্যন্ত গিয়াছে। সেই পথের দুইধারে আম ও বকুল গাছের সারি। সদর দরজার দুই ধারে কাছারি-বাড়ী, বরকন্দাজদের থাকিবার ঘর।

রহিম খাঁ নিজে তাহার দলের সাহসী ও দুর্ধর্ষ ডাকাতদের লইয়া উদয়নারায়ণের বাড়ী ডাকাতি করিতে চলিল। সঙ্গে সে ছোট একটা ডিঙ্গি নৌকা আনিয়াছিল। তাহা দিয়া তাহারা পরিখা পার হইল এবং প্রাচীর বাহিয়া, কেহ বা গাছে উঠিয়া দেওয়াল টপকাইয়া, বাড়ীর ভিতরকার মন্দিরের চূড়া ধরিয়া দলে দলে চারিদিক হইতে বাড়ীর ভিতরে নামিতে লাগিল, দরজা কপাট ভাঙ্গিতে শুরু করিল। তাহারা একসঙ্গে শত শত মশাল জ্বালিল। জয় মা কালী রবে নিস্তব্ধ গ্রামের বনজঙ্গল, প্রান্তর ধ্বনিত হইতে লাগিল! হা-রে-রে-রে রবে বিকট চীৎকার আরম্ভ হইল। অপরদিকে সদর দেউড়িতে দেখা দিল আর একদল ডাকাত। তাহাদের সঙ্গে আরম্ভ হইল হাতাহাতি লড়াই। চারিদিকের গোলমাল, হৈ-চৈ ও ভীষণ চীৎকারে দয়াময়ীর নিদ্রাভঙ্গ হইল। তিনি শিশু সীতারামকে লইয়া পরিচারিকাসহ শুইয়াছিলেন। জাগিয়া জানালার ফাঁক দিয়া দেখিলেন দস্যুরা বাড়ী আক্রমণ করিয়াছে—অন্দরের দিকে ছুটিয়া আসিতেছে। ভীষণ তাহাদের মূর্তি! কাহারও এক হাতে মশাল, অন্য হাতে বল্লম, কাহারও হাতে তলোয়ার।

ক্রোধে তাঁহার নয়নযুগল দীপ্ত হইয়া উঠিল। তিনি পরিচারিকাকে বলিলেন—শিশুদের রক্ষা কর। আমি ডাকাত তাড়াইব—নয় মরিব। কি এত বড় আস্পর্ধা—আমাদের বাড়ী লুঠ করিবে রহিম খাঁ পাঠান! অসহ্য।

দয়াময়ী শক্ত করিয়া কাঁচুলি পরিলেন, পুরুষের মত কাপড়

পরিলেন—তারপর এক হাতে সুতীক্ষ্ণ দীর্ঘ তরবারি আর অন্য হাতে বল্লম লইয়া চলিলেন ডাকাত তাড়াইতে!

পরিচারিকা চীৎকার করিয়া উঠিল—মা—মা—এমন দুঃসাহসের কাজ করিবেন না। চলুন খিড়কির দরজা দিয়ে পালাই।

দয়াময়ী গর্জিয়া উঠিলেন—পালাব? কার ভয়ে বল্ ত? কখনো নয়—কখনো নয়!

আর একটিও কথা না বলিয়া চলিলেন তিনি ডাকাতদের অন্দর-মহল হইতে তাড়াইয়া দিতে।

যেই পথে তিনি নীচে নামিতেছিলেন, সেই পথে সিঁড়ি দিয়া ডাকাতেরা উপরে উঠিতেছিল। সেই পথেই দেখা হইল দস্যুদের সঙ্গে। স্তিমিত আলোকে এই রণরঙ্গিনী নারীকে দেখিয়া দস্যুরা চমকাইয়া উঠিল—দুই পা পিছাইয়া গেল। দয়াময়ী সেই মুহূর্তে বর্শা ছুঁড়িয়া মারিলেন এক ডাকাতকে লক্ষ্য করিয়া। বর্শা ডাকাতের বুকে বসিল -হতভাগ্য দস্যু উঃ আঃ করিতে করিতে প্রাণ হারাইল। অপর দস্যুরা ভয়ে দৌড়িয়া পলাইল। তর তর করিয়া দয়াময়ী নীচে ছুটিয়া চলিলেন সদর দেউড়ির দিকে। সেখানে রহিম খাঁর সহিত বরকন্দাজদের লড়াই চলিতেছিল ভীষণভাবে। এমনি সময়ে সেখানে আসিয়া বল্লম হস্তে দাঁড়াইলেন তেজস্বিনী মহিমময়ী নির্ভীকা বীরাঙ্গনা দয়াময়ী। সে কি অপূর্ব মূর্তি।

বরকন্দাজদের সর্দার রঘুনাথ তাঁহাকে দেখিয়া নতমস্তকে প্রণাম করিয়া বলিয়া উঠিল—মা, আপনি! আপনি কেন?

দৃপ্তকণ্ঠে দয়াময়ী জবাব দিলেন—হাঁ বাবা, আমি। কর্তা নেই বলে কি ডাকাতের আক্রমণে ভয় পাব? ভাল করে লড়াই কর। আমিও তোমাদের সঙ্গে থেকে লড়ব।

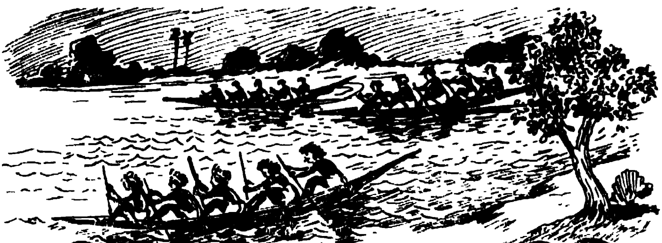
দলে দলে গ্রামের লোক রায়বাড়িতে ডাকাত পড়িয়াছে শুনিয়া আসিয়া যোগ দিল ডাকাত তাড়াইতে! দয়াময়ী আরম্ভ করিলেন লড়াই। তাঁহাকে দেখিয়া গ্রামের লোকের মধ্যে মহা-উৎসাহের সঞ্চার হইল! মধ্যস্থলে তাঁহাকে রাখিয়া তাহারা মহা-বীরত্বের সহিত ডাকাতদের সঙ্গে যুদ্ধ করিতে লাগিল। রহিম খাঁর দলের লোকেরা

ভয়ে ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়িতেছিল। ডাকাতরা দয়াময়ীর তলোয়ারের ঘায়ে একে একে প্রাণ দিতে লাগিল। একদিকে রঘুনাথ সর্দার আর অপরদিকে দয়াময়ী। এই দুই জনের অসাধারণ বীরত্ব ও শৌর্যের নিকট ডাকাতেরা হার মানিতেছিল। কি অপূর্ব তাহাদের লড়াই-শিক্ষা!

রহিম সর্দার গর্জিয়া উঠিল—কি, একটা জেনানার কাছে হার মানব? এই বলিয়া সে কয়েকজন সাহসী পাঠানকে সঙ্গে লইয়া মন্দিরের চত্বরের দিকে ছুটিয়া আসিল। সে তীরবেগে ছুটিয়া আসিতেছিল দীর্ঘ তলোয়ার হাতে—ভীষণ দৈত্যের মত তাহার আকৃতি! সে বলিল—ঘিরে ধরে ফেল জেনানাকে। এগিয়ে যাও।

এদিকে এক নিমেষে রহিমের বুকে বিদ্ধ হইল দয়াময়ীর নিক্ষিপ্ত বল্লম। যেমনি সে চিৎ হইয়া পড়িয়া গেল, অমনি তরবারির এক আঘাতে দয়াময়ী তাহার মাথা কাটিয়া ফেলিলেন। মৃত্যুর পূর্বে 'ইয়া আল্লা!' এই একটিমাত্র শব্দ রহিমের মুখ হইতে উচ্চারিত হইয়াছিল। তারপর সব শেষ! রঘুনাথ সর্দার অবাক্ বিস্ময়ে দেখিল দয়াময়ীর বীরঙ্গনা মূর্তি। সর্বাঙ্গে রুধির-ধারা। বস্ত্র রুধির-লিপ্ত, কেশ মুক্ত, নয়নদ্বয় হইতে বিচ্ছুরিত হইতেছে অগ্নিকণা। হাতে রুধিরলিপ্ত শাণিত তরবারি। কালান্তক যম সদৃশ রহিম খাঁর এইরূপ মৃত্যুতে ডাকাতের দল পলাইতে লাগিল। কেহ কেহ ধরা পড়িল—অনেকে পলাইয়া বাঁচিল।

সীতারাম ছিলেন এমন বীরাঙ্গনার পুত্র। এমন মা না হইলে কি অমন ছেলে হয়? প্রতিষ্ঠা করিতে পারে স্বাধীন হিন্দুরাজ্য?



গোপী ডাকাতের কাহিনী

এক

নীলকান্ত মুখোপাধ্যায় পূজার ছুটিতে বাড়ী যাইতেছেন। সঙ্গে তাঁহার একমাত্র ছেলে অমিয়রঞ্জন এবং একজন গ্রামবাসী আত্মীয়। অমিয়রঞ্জন যুবক—কলেজে পড়ে। দীর্ঘদেহ, গৌরবর্ণ, পরম সুন্দর উৎসাহী তরুণ সে। নীলকান্তবাবু বরিশালের একজন প্রসিদ্ধ উকীল। সেখানে বাসাবাড়ী আছে। লোকজন আত্মীয়-স্বজনের অভাব নাই। তাহারাও পূজার ছুটিতে বাড়ী চলিয়া গিয়াছে। মুখোপাধ্যায় মহাশয়ও বাড়ী যাইতেছেন। তাঁহার সঙ্গে পুত্র অমিয় ও আত্মীয়টি ছাড়া পুরাতন ভৃত্য হরচন্দ্রও আছে। হরচন্দ্র বলিষ্ঠকায়, বয়স পঞ্চাশের উপর। এক সময়ে সে ছিল লাঠিয়াল—ডাকাতি করিত। বরিশালের কোন এক জমিদারের কাছে থাকিত। জমি দখল করিতে, চর দখল করিতে, সে ছিল দক্ষ, সর্দার। একবার সে এক খুনের মোকদ্দমায় পড়ে। নীলকান্ত বাবুর চেষ্টায় সে খালাস হইয়া আসে। সেদিন হইতে সে ডাকাতি ও দস্যুবৃত্তি ছাড়িয়া দিয়াছে। এখন সে নিরীহ ভাল মানুষ। গলায় তুলসীর মালা। এক বৈষ্ণব বাবাজীর কাছে সে দীক্ষা লইয়াছে। দিবারাত্রি 'হরেকৃষ্ণ' নাম জপ করে। তবে মফঃস্বলে যাইতে হইলে হরচন্দ্র বহুকালের পুরোন একখানা বাঁশের লাঠি আর একটা বর্শা ও খাঁড়া লইতে ভোলে না।

নীলকান্তবাবুর বাড়ী বিক্রমপুরে। কুলীন ব্রাহ্মণ। বয়স ষাটের কাছে। মাথার চুলগুলি পাকা! গোঁফ দাড়ি নাই। উন্নত নাসা, দীর্ঘকায় গৌরবর্ণ পুরুষ, সাহসী ও সজ্জন। প্রতি বৎসর কাছারি ছুটি হইলে বাড়ী যান। শ্যামাপূজা পর্যন্ত বাড়ীতে থাকেন; তারপর কাছারি খুলিলে বরিশাল ফিরিয়া আসেন।

নীলকান্ত বাবু তিন-কামরাওয়ালা বড় একখানা পানসী নৌকায় বাড়ী যাইতেছেন। পানসীর সঙ্গে আছে দুইখানি ভাওয়ালি নৌকা। তাহাতে পূজার সম্ভার। অমিয় নৌকার ছাতে বসিয়া চারিদিকের শোভা দেখিতেছে। শরতের উচ্ছল নদীর সাদা জল ছোট ছোট ঢেউ তুলিয়া চলিয়াছে। নীলকান্ত বাবু নৌকার ভিতরের কোঠায় বসিয়া দেশগামী আত্মীয়ের সঙ্গে কথা বলিতেছেন। হরচন্দ্র ভাওয়ালি নৌকায় পূজার বিবিধ উপকরণ ও অন্যান্য জিনিসের তদ্বির করিতেছে। সঙ্গের পাচকেরা রান্নার আয়োজন করিতেছে। জোয়ারের স্রোতে নৌকা আপনা হইতেই বেগে চলিতেছে।

এইভাবে তাহাদের নৌকা রাত্রি দুপুরের সময় আসিয়া পড়িল দুইটি নদীর সঙ্গমস্থলে। পাশে বড় বড় কয়েকটি গ্রাম। মাঝিরা বলিল, বাবু! এ অঞ্চলটা একেবারে ভাল নয়। প্রায় প্রতিদিনই ডাকাতি হয়। বিশেষতঃ এসময়ে মাল-বোঝাই নৌকা এবং পূজার সময় দেশগামী যাত্রী-নৌকার উপর ডাকাতি ও রাহাজানি হয়ে থাকে। আপনারা সকলে সতর্কভাবে জেগে থাকবেন।

নৌকা স্রোতের টানে তর-তর করিয়া দ্রুতবেগে চলিতেছে, মাঝি চুপ করিয়া হাল ধরিয়া আছে। শুক্লপক্ষের চাঁদের আলো নদীর এবং জলে দূর পল্লীর গাছপালার উপর পড়িয়া কত সুন্দর দেখাইতেছিল। জোছনা যেন হাসিতেছিল। মাঝে মাঝে চাঁদ মেঘের আড়ালে লুকাইতেছিল। এমন সময় কয়েকখানি ছিপ নৌকা আসিয়া মুখুয্যে মহাশয়ের পানসী ও অন্য নৌকা দুইখানিকে ঘিরিয়া ফেলিল এবং "হা-রে-রে-রে" করিয়া বিকট চীৎকারে চারিদিক প্রতিধ্বনিত করিয়া পানসীর উপর ঝাপাইয়া পড়িল। মাঝি-মাল্লারা এবং হরচন্দ্র ডাকাত পড়িয়াছে বলিয়া চীৎকার করিতে লাগিল, কিন্তু কে শোনে কাহার চীৎকার? কে আসিবে এই দুর্গম স্থানে নদীর বুকে তাহাদের রক্ষা করিতে? ছিপ নৌকাগুলির পাশে একখানি অপেক্ষাকৃত বড় নৌকা আসিল। সেই নৌকার উপর হইতে একটি বলিষ্ঠকায় ব্যক্তি উচ্চৈঃস্বরে বলিয়া উঠিল--হারু, কি দেখছ? নৌকা লুঠ কর।

নীলকান্ত বাবু নৌকার সম্মুখে আসিয়া করুণকণ্ঠে বলিলেন—

আপনি কে জানি না। আপনি যে হউন, আমি বরিশালের উকীল নীলকান্ত মুখুয্যে। পূজোতে বাড়ী যাচ্ছি, মায়ের শ্রীচরণে অঞ্জলি দিতে। সঙ্গে আছে মায়ের পূজার দ্রব্যসম্ভার।

হারু সর্দার নীলকান্ত বাবুর সৌম্য শান্ত সুন্দর মূর্তি দেখিয়া কহিল —ইনি যে ব্রাহ্মণ! কর্তা, এঁর গায়ে হাত তুলবো কি করে?

বড় নৌকা হইতে আরোহী চীৎকার করিয়া বলিল—তুই না পারিস্ হারু, আমিই এ বেটাকে নিকাশ করবো। এই কথা বলিয়া লোকটি একটা তলোয়ার হাতে ক্রুদ্ধ মহিষের মত নীলকান্ত বাবুর নৌকায় লাফাইয়া পড়িয়া তাঁহাকে আক্রমণ করিতে অগ্রসর হইল।

সেই সময়ে অমিয় আসিয়া তাহার পিতাকে বুকে জড়াইয়া ধরিল এবং নৌকার কক্ষটিতে তাঁহাকে প্রবেশ করাইয়া দিল। তারপর সেই ভীষণাকৃতি ক্রুদ্ধ ডাকাতের কাছে আসিয়া বলিল—আপনি ডাকাত হন, দস্যু হন,—আপনি মানুষ ত বটেন। আমাকে কেটে ফেলুন, আমার বাবার গায়ে হাত তুলবেন না।

এই কথা বলিয়া অমিয় ডাকাতের সম্মুখে আসিয়া নির্ভীকভাবে দাঁড়াইল। দস্যুও যেন একটু বিচলিত হইল। নীলকান্ত বাবু তড়িৎগতিতে পুত্রের পিছনে আসিয়া দাঁড়াইলেন এবং তাহাকে দুই বাহুর দ্বারা সবলে বুকের মধ্যে জড়াইয়া ধরিয়া, কহিলেন—দেখুন, আপনি ডাকাত হন, দস্যু হন, যাই হন না কেন, আপনি ত মানুষ। পিতার কাছে পুত্রের নিধন আর পুত্রের কাছে পিতৃহত্যার দৃশ্য কত বড় শোচনীয়, তা বুঝবার মত শক্তি আপনার আছে। বরং আপনি আমাদের নৌকায় যা কিছু আছে সব লুটে নিন, আমরা জগজ্জননীর পায়ে ফুল আর বেলপাতা দিয়েই অঞ্জলি দিব।

ধীর স্থির ভাবে দৃঢ়তার সহিত বলিলেন কথা কয়টি নীলকান্ত মুখোপাধ্যায়। তারপর পুত্রকে দেখাইয়া বলিলেন—এই আমার একমাত্র বংশধর। একে রক্ষা করুন, এর প্রাণ ভিক্ষা দিন। বলিতে বলিতে কাঁদিয়া ফেলিলেন নীলকান্ত বাবু।

এমন সময় হঠাৎ মেঘের ফাঁক দিয়া এক ঝলক হাস্যমুখী জোছনা আসিয়া পড়িল নীলকান্তবাবু ও তাঁহার পুত্রের মুখের উপর।

চমকিয়া উঠিল দস্যুসর্দার ; জিজ্ঞাসা করিল আপনার নাম কি বলুন ত ? আমার নাম নীলকান্ত মুখোপাধ্যায়। ভয়কাতর-কম্পিত কণ্ঠে বলিলেন নীলকান্ত বাবু।

হঠাৎ মুখুয্যে মহাশয়ের পানসী হইতে দস্যুসর্দার লাফাইয়া পড়িল নিজের নৌকায়, হুকুম দিল ভৈরব-রবে— শোন হারু, রাত্রি-শেষে এইসব নৌকা নিয়ে যাবি আমার বাড়ীর ঘাটে। সাবধান, কারু গায়ে হাত দিবি নে, কোন অনিষ্ট করবি নে, সারারাত নৌকায় দিবি পাহারা। তারপর সকালবেলা আমাকে দরবারে খবর দিবি। এঁদের খাওয়া দাওয়ার সব ব্যবস্থা করবি।

ধীরে ধীরে নৌকা তিনখানি তীরের দিকে নেওয়া হল। ডাকাত-সর্দার তাহার নৌকায় উঠিয়া চলিয়া গেল।

হারু সর্দার বিস্মিত হইল তাহার মনিবের এইরূপ হুকুমে। কোন দিন ত এমন হয় না। ছিপ নৌকাগুলি, পানসী ও অন্য দুইখানি নৌকা পাহারা দিয়া নদীর স্রোতের মুখে অগ্রসর হইল।

দুই

একশো বছর আগে ডাকাত গোপী বাড়ুয্যের নাম ছিল কুখ্যাত। এমন কোন কুকার্য ছিল না, যা তিনি করেন নাই।

অথচ গোপীবাবু ছিলেন জমিদার। বারমাসে করিতেন পূজা-পার্বণ,—দীনদরিদ্র সকলে পাইত মায়ের প্রসাদ। কোন অভাব না থাকিলেও তিনি ডাকাতি করিতেন - একদিনও ডাকাতি না করিয়া ঘরে বসিয়া থাকিতে পারিতেন না। কাহার পরিবার-পরিজন নদী-খালে আসা-যাওয়া করিতেছে, সেই সংবাদ তাঁহার কাছে দিত তাঁহার দলের লোকেরা। সেই অনুসারে প্রতিদিন গভীর রাত্রিতে বাড়ীর মধ্যে প্রতিষ্ঠিতা শ্মশানবাসিনী দেবী জয়কালীর পূজা দিয়া বাহির হইতেন ডাকাতি করিতে। প্রতি অমাবস্যা রাত্রিতে জাঁকজমকে করিতেন দেবীর পূজা—মাঝে মাঝে হইত নরবলি।

সেদিন সংবাদ পাইয়াছিলেন বরিশালের একজন বিখ্যাত উকীল এই পথে যাইবেন বাড়ীতে। সঙ্গে আছে তৈজসপত্র ও অনেক

টাকাকড়ি। তাই দলবল সঙ্গে করিয়া উকীলের নৌকা লুঠ করিতে গিয়াছিলেন। কিন্তু কেন যে নৌকা লুঠ না করিয়া গোপীবাবু ফিরিয়া আসিলেন—তাহা হইল এক রহস্যময় আশ্চর্যের বিষয়।

তিন

গোপীবাবুর সংসারে স্ত্রী, এক পুত্র ও এক কন্যা। কন্যা শরৎসুন্দরীর বয়স প্রায় ষোল বৎসর—অপূর্ব সুন্দরী সে। যেমন রূপ, তেমন গুণ। সাংসারিক কাজকর্মে সেকালের নানা শিল্পকার্যে দক্ষ, ভক্তিমতী মেয়েটিকে দেখিয়া তাহার ব্যবহারে লোকে মনে করিত—কেমন করিয়া মরুর বুকে প্রবাহিত হইল স্বর্গ-মন্দাকিনী? পাষাণের বুক দিয়া উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল সুধা-প্রস্রবণ? ছেলে দেবকীরঞ্জন কলেজে পড়ে কলিকাতায়। ভাল ছেলে, প্রকৃতি সুন্দর। সে বাড়ীতে আসিলে পড়াইত শরৎকে। তাহাদের চরিত্রের সহিত পিতার চরিত্রের কোন ঐক্য ছিল না। পিতার দস্যুবৃত্তির কথা তাহারা শুনিয়াছিল, এজন্য সকলে বিষণ্নমনে থাকিত। তাহারা দেখিত তাহাদের মা দিন দিন শীর্ণা ও বিবর্ণা হইয়া যাইতেছেন। তিনি সর্বদা বিষণ্নমনে থাকিতেন যেন একখানি বিষাদের প্রতিমা। গোপীবাবুর স্ত্রী নিস্তারিণী ছিলেন সাধ্বী সতী, পুণ্যবতী—কোনরূপ সাংসারিক ব্যাপারের ধার ধারিতেন না। পাপকার্য হইতে বিরত থাকিবার জন্য স্বামীকে বহুবার অনুরোধ করিয়াও তিনি কৃতকার্য হন নাই—তাই সর্বদা তিনি নিজের মৃত্যু কামনা করিতেন।

সেদিন নৌকা হইতে বাড়ী ফিরিয়া আসিয়া গোপীবাবু নিজের ঘরে গিয়া চুপ করিয়া শুইয়া পড়িলেন। রাত্রি প্রভাত হইলে গোপীবাবু গেলেন নীচের দপ্তরখানায়। নিস্তারিণী স্বামীর এই পরিবর্তন লক্ষ্য করিলেন, কিন্তু একটি কথাও বলিলেন না।

চার

প্রকাণ্ড প্রাসাদ। নদীর তীর হইতে প্রশস্ত পথ বাড়ী পর্যন্ত আসিয়াছে। বিরাট চকমিলান অট্টালিকা। বাহিরে কাছারি, দপ্তরখানা। ভিতরে ত্রিতল দালান। নীচে উপরে ছোট বড় প্রায়,

ত্রিশটা ঘর। নীচের তলে কাছারিবাড়ীর কাছে বিরাট আঙ্গিনা। পথের দুইদিকে শিবের মন্দির, বিরাট দীঘি। প্রতিদিনকার মত গোপীবাবু নীচে আসিয়া নিজে হারু সর্দার ও কাছারির পাইক-বরকন্দাজসহ নদীর পারে গেলেন বাঁধান ঘাটের কাছে। ঘাটের দুইপাশে দুইটি বিরাট বকুলগাছ। ঝুরঝুর করিয়া বকুলফুল ঝরিতেছে। গোপীবাবু আসিয়া দেখিলেন, নীলকান্ত বাবু ও তাঁহার পুত্র অমিয়রঞ্জন নৌকার সম্মুখের পাটাতনে বিষণ্ণমুখে বসিয়া আছেন।

গোপীবাবু নমস্কার করিয়া বিনীতভাবে কহিলেন—মুখুয্যেমশায়, আপনাকে আমার বাড়ীতে একটু পায়ের ধুলো দিতে হবে। আপনার ছেলেসহ আসুন।

নীলকান্তবাবু বলিলেন—আপনার যদি আমাদের প্রতি দয়া হয়ে থাকে, তবে যাবার ব্যবস্থা করে দিন। পূজো নিকটবর্তী।

গোপীবাবু কহিলেন—'সে হবে, আসুন। আমি আপনাকে অভয় দিচ্ছি, কোন অনিষ্ট হবে না আপনার। আসুন।'

নীলকান্তবাবু একবার পুত্রের মুখের দিকে চাহিলেন, পুত্রও পিতার মুখের দিকে চাহিল। তারপর দুইজনে হারু সর্দারকে সঙ্গে লইয়া গোপীবাবুর সঙ্গে চলিলেন বাড়ীর দিকে।

গোপীবাবু বাড়ীতে প্রবেশ করিয়া নীলকান্ত বাবুকে বলিলেন—ভাই, তোমার সঙ্গে আমার নিভৃতে একটু কথা বলবার আছে। তারপর অমিয়র দিকে চাহিয়া কহিলেন—বাবা, আমি আমার ছেলে দেবকীকে ডেকে দিচ্ছি, তুমি তার সঙ্গে কথা বলো।

পিতার আহ্বানে পুত্র আসিল। প্রিয়দর্শন তরুণ যুবক দেবকীরঞ্জন অতি সুপুরুষ গৌরকান্তি অমিয়কে দেখিয়া মুগ্ধ হইল। উভয়ের পুত্রের পরস্পরের পরিচয় হইতে বেশীক্ষণ দেরী হইল না। দেবকী বলিল—চল ভাই, আমার মার কাছে গিয়ে গল্প করি।

অমিয় ইতস্ততঃ করিতেছিল, কিন্তু দেবকী তাহাকে কোন অবসর দিল না। তাহার হাত ধরিয়া লইয়া উপরে চলিয়া গেল।

এদিকে গোপীবাবু নীলকান্তবাবুকে লইয়া বাড়ীর এক অতি নিভৃত কক্ষে আসিলেন। বিরাট সুসজ্জিত ঘর। ছাদের নীচে ঝাড়লণ্ঠন

ঝুলিতেছে। বড় বড় আলমারিতে সারি সারি বই সাজানো। গোপীবাবু বলিলেন—এই আমার পড়বার ঘর—লাইব্রেরী। তারপর একটি দেরাজ হইতে একখানি ছবি বাহির করিয়া বলিলেন,—চিনতে পার ?

সেই আঁধার কক্ষে আলো জ্বলিয়া উঠিল। নীলকান্ত ছবি দেখিয়া চমকাইয়া উঠিলেন—উচ্চস্বরে কহিলেন—"এ যে গোপীনাথ আর আমার ফটো ! কে তুমি, কে তুমি।

আমি গোপীনাথ—এই কথা বলিয়াই গোপীবাবু নীলকান্ত বাবুর পা দুইখানি জড়াইয়া কহিলেন—নীলু, আমায় ক্ষমা কর, আমায় রক্ষা কর। আমি হতভাগা তোমার এক সময়ের প্রিয়বন্ধু গোপীনাথ। তুমি আমাকে একবার মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচিয়েছিলে,—আর আমি পাষণ্ড, আমি অপদার্থ, তোমাকে ও তোমার পুত্রকে হত্যা করে বন্ধুত্বের পরিচয় দিচ্ছিলাম। আমায় ক্ষমা কর, রক্ষা কর, আবার আমাকে পাপের পঙ্কিলতা থেকে উদ্ধার কর। নতুবা তোমায় ছেড়ে দেবো না।

নীলকান্ত বাবু বিচলিত হইয়া পড়িলেন ! গোপীবাবুকে জড়াইয়া ধরিয়া কাঁদিতে লাগিলেন—গোপী, তুই কেমন করে এমন হলি ? তুই যে ছিলি বড় ভালো। তুই কি সেই গোপী ?

হাঁরে নীলু, আমি সেই গোপী। তারপর গোপীনাথ বাষ্পরুদ্ধ-কণ্ঠে তাহার জীবনের কলঙ্ককাহিনী বলিতে লাগিলেন। কহিলেন—আমার পিতা, পিতামহ সকলেই ছিলেন ডাকাত। ডাকাতি করে, নরহত্যা করে, তাঁরা করে গেছেন এই বিশাল বাড়িঘর ও ধনসম্পত্তি। আমার রক্তের ধারার মধ্যেও প্রবাহিত হচ্ছে সেই রক্তের ধারা। তাই আমি আজ নরঘাতক দস্যু, ডাকাত, পরস্বাপহারী দুর্বৃত্ত পাষণ্ড। আমাকে আবার ফিরিয়ে নে সেই ছাত্রজীবনের মাঝখানে—পরিয়ে দে তোর রক্ষাকবচ, আমাকে সরল মনে মানুষ হতে দে ! আমার শান্তি নেই। পুত্রকন্যা আমায় ঘৃণা করে। স্ত্রী চিন্তায় চিন্তায় মৃতপ্রায়—শয্যাশায়িনী ! দিনরাত হৃদয় পুড়ে খাক্ হয়ে যাচ্ছে—তবু ডাকাতি করি। আমার ভাগ্যি, তুই এসেছিস্ ! আমাকে বাঁচা ভাই।

নীলকান্ত দরদভরা-কণ্ঠে কহিলেন—আমি যে ক্ষুদ্র মানুষ। ঈশ্বরের কৃপা ভিক্ষা কর ভাই। তিনিই তোর প্রাণে শান্তি দেবেন।

সেদিন গোপীনাথ করিলেন বাড়ীতে বিরাট আনন্দ-ভোজের আয়োজন। সকলে বিস্মিত হইল—এমন ত কোনদিন হয় না।

পাঁচ

অমিয় ও দেবকী উপরের ঘরে উপস্থিত হইল। তাহারা তুইজনে নিস্তারিণী দেবীকে প্রণাম করিতেই তিনি অমিয়ের দিকে চাহিয়া করিলেন—এস বাবা, এস। এই বলিয়া মাথায় হাত দিয়া আশীর্বাদ করিলেন।

কন্যা শরৎসুন্দরী একপাশে ফুটন্ত শেফালীর মত বসিয়াছিল, তাহার দিকে চাহিয়া মা কহিলেন তোর নূতন দাদাকে প্রণাম কর শরৎ।

লজ্জায় সংকুচিতা হইয়া আসিয়া শরৎ প্রণাম করিল অমিয়কে। অমিয় লজ্জায় মাথা নত করিল। শরতের মুখের দিকেও চাহিতে পারিতেছিল না! নিস্তারিণী দেবী অপলকে একবার অমিয়র দিকে আবার শরতের দিকে চাহিতেছিলেন।

পরদিন সকালে নীলকান্ত ও অমিয়কে বিদায় দিলেন গোপীবাবু। নানারূপ ফল, তৈজসপত্র, বিরাট পূজোপকরণ তাঁহাদের সঙ্গে দিয়া হারু সর্দার ও অন্য কয়েকজন সাহসী সর্দারকে হুকুম দিলেন তাঁহাদের নিরাপদে বাড়ী পৌঁছাইয়া দিবার জন্য। সেদিন হইতে গোপীবাবুর মধ্যে দেখা দিল একটা পরিবর্তন। কেহ লক্ষ্য করিল, কেহ করিল না।

পূজা শেষ হইল। ওদিকে বিক্রমপুরের নিজ বাসগ্রাম হইতে নীলকান্তবাবু বরিশাল ফিরিয়া যাইবার উদ্যোগ-আয়োজন করিতেছেন, এমন সময়ে একদিন তাঁহার বাড়ীর ঘাটে আসিয়া ভিড়িল এক বিরাট বজরা, তাহাতে ছিল অনেক দ্রব্যসম্ভার। স্বয়ং দেবকীরঞ্জন আসিয়াছে ওই সব লইয়া, সঙ্গে আছে তাহাদের প্রিয় সর্দার হারু।

দেবকীরঞ্জন নীলকান্ত বাবুকে প্রণাম করিয়া একখানি পত্র দিল। তাহাতে লেখা ছিল—

ভাই নীলু, ছাত্রজীবনে তোমাকে যে নামে সম্বোধন করিতাম, দীর্ঘকাল পরে এই নরাধম আবার তোমাকে সেই প্রিয় নামে সম্বোধন করিল। আমার রক্ত-কলঙ্কিত হস্তের এই পত্র তোমাকে পাঠাইলাম,

ক্ষমা করিয়া গ্রহণ করিও। জান ত ভাই, ছেলেবেলা ঢাকার ব্যাপটিস্ট মিশন হলে ধর্মযাজকের মুখে শুনিয়াছিলাম—'পাপকে ঘৃণা করো, কিন্তু পাপীকে ঘৃণা করো না।' কাজেই আমাকে ঘৃণা করিও না। আমি তোমাকে এ চিঠি লিখিতে সাহসী হইতাম না, যদি না আমার গৃহিণী আমাকে উৎসাহিত করিতেন। পুত্রকেও পাঠাইলেন তিনি উদ্যোগী হইয়া! পিতার প্রতি বিরূপ হইতে পার, কিন্তু নির্দোষ পুত্রের প্রতি বিরূপ হইও না। আমার ও আমার স্ত্রীর শত শত মিনতি, তুমি বরিশাল যাইবার পথে শ্রীমান্ অমিয়কে সহ একদিনের জন্য আমার বাড়ীতে অতিথি হিসাবে থাকিয়া যাইও। ইতি—

—অধম গোপী

নীলকান্ত বাবু স্ত্রী পুত্রসহ আত্মীয়-স্বজনের মত লইয়া নৌকা-যোগে বরিশাল যাত্রা করিলেন।

ছয়

—কাটি গ্রামে জমিদারের বাড়ীর ঘাটে নৌকা ভিড়িল। অমনি নহবৎখানা হইতে নহবৎ বাজিয়া উঠিল। পরম উৎসাহের সহিত তাঁহাদের বাড়ীর ভিতর লইয়া গেলেন গোপীবাবু। তারপর মধ্যাহ্ন-ভোজনের পর গোপীবাবু একখানি চরমপত্র বা উইল দিলেন নীলকান্ত বাবুর হাতে। নীলকান্ত বাবু উহা পড়িয়া অবাক্ হইলেন।

গোপীবাবু উইলে লিখিয়াছেন—'আমার স্থাবর অস্থাবর সমুদয় সম্পত্তি আমার পুত্র শ্রীমান্ দেবকীরঞ্জনকে এবং আমার জামাতা শ্রীমান্ অমিয়রঞ্জন ও কন্যা শরৎসুন্দরীকে দান করিলাম। আর ইহাদের অভিভাবকত্ব—এস্টেটের সর্ববিধ কার্য পরিচালনার দায়িত্ব দিলাম আমার বন্ধু ও আত্মীয় শ্রীযুত নীলকান্ত মুখোপাধ্যায় উকীলের হস্তে।' উইলখানা পড়ার পর নীলকান্তবাবু কিছুক্ষণ নীরবে থাকিয়া কহিলেন—এ কি করেছ গোপী?

গোপীবাবু বলিলেন—ঠিক কথা ভাই! আমি আর সংসারে থাকবো না। শেষজীবনটা স্বামী ও স্ত্রী কাশীবাসেই যাপন করবো।

কিছু অন্যায় করি নি। তোমার ছেলেকে আমি চাই। আর তোমার কন্যাটিকেও দিতে হবে আমাকে।

নীলকান্তবাবু ও তাঁহার স্ত্রী, গোপীবাবু ও তাঁহার স্ত্রীর নির্বন্ধাতিশয্যে সম্মত হইলেন। এক শুভদিনে দেবকীরঞ্জনের সহিত নীলকান্ত বাবুর কন্যা মানদার এবং অমিয়রঞ্জনের সহিত শরৎসুন্দরীর বিবাহ হইয়া গেল। বহু অর্থ ব্যয় করিয়া অত্যন্ত আড়ম্বরের সহিত দুই পরিবারের মধ্যে মিলনসেতু গড়িয়া উঠিয়াছিল।

সত্য সত্যই সমুদয় ধন-সম্পত্তি দান করিয়া এক শুভদিনে দুর্দ্ধর্ষ ডাকাত গোপীনাথ দেশ ত্যাগ করিল।

নীলকান্তবাবু যতদিন জীবিত ছিলেন, ততদিন জমিদারীর সর্ববিধ বিষয়ের তত্ত্বাবধান করিতেন এবং উইলের অন্য শর্ত অনুসারে গোপীবাবু ও তাঁহার স্ত্রীর ব্যয় নির্বাহার্থ মাসিক মাসোহারা পাঠাইতেন।

সময়ে দুই পরিবার বড় তরফে ও ছোট তরফে পরিণত হইল। পরবর্তী কালে এই দুই হিস্যার ভূস্বামীরা দেশের ও দশের মহৎ উপকার করিয়া গিয়াছেন। গোপীনাথ উচ্চ বিদ্যালয়, নিস্তারিণী দাতব্য চিকিৎসালয়, অতিথিশালা প্রভৃতির অস্তিত্ব সেদিনও বিদ্যমান ছিল। এখনও দুই পরিবারের বংশধরেরা জীবিত আছেন। জমিদারী নাই, কিন্তু তাঁহাদের মধ্যে এখনও আছে মহত্ব ও বদান্যতা।



ডাকাতের খাল

এক

বর্ধমান জেলায় ডাকাতের খাল।

কাটোয়ার অনেকটা দূরে গঙ্গা হইতে এ খাল বাহির হইয়া গ্রামের ভিতর গিয়াছে। এই খাল বেশ চওড়া ছিল—অন্ততঃ গঙ্গার মুখের কাছাকাছি, তার পর ক্রমশঃ সরু হইয়া কোথাও মাঠ, কোথাও বিল, কোথাও চাষীদের ছোট ছোট গ্রামের ভিতর দিয়া বহিয়া গিয়াছে দূর প্রান্তে!

দুই পাশে বড় ছোট, সব রকমের গ্রামই আছে। কোন গ্রামে বেশ ধনী জমিদার, তালুকদার, ব্যবসায়ীর বাস। তাঁহাদের বড় বড় পাকাবাড়ী তালগাছের আড়ালে, আম-কাঁঠালের ঘেরা বনে শোভা পায়, আবার খালের পারে চাষী, বাগ্দী নানা জাতির লোকেরাও বাস করে।

যে সময়ের কথা বলিতেছি—তাহা ইংরেজ আমলের প্রথম যুগের কথা। পলাশীর যুদ্ধের পর দেশে চলিয়াছে অরাজকতা। নামে শাসক নবাব—কিন্তু শাসন করে ইংরেজ কোম্পানী। তাহারা চায় টাকা, শোষণ করে রক্তচোষা বাদুড়ের মত প্রজার রক্ত। প্রজার টাকা নাই, খাদ্য নাই, তবু দেয় টাকা। নবাবী ফৌজের সৈনিকরা ফৌজ হইতে বিদায় হইয়াছে। তাহারা বেকার—অথচ খাওয়া চাই। তাহারা ঘুরিয়া বেড়ায়,—দল বাঁধিয়া করে ডাকাতি। সঙ্গে তাহাদের জুটিয়াছে—ঠেঙ্গাড়ে, ঠগী আর অপর ডাকাত দল। এই দলের লোকেরা এখান দিয়া গঙ্গার স্রোত ধরিয়া গ্রামে ঢোকে জোয়ারের সাথে আবার ভাটার টানে গঙ্গার বুকে আসিয়া নির্বিঘ্নে চলিয়া যায় ভিন্ন ভিন্ন

পথে। দেশে শাসন নাই, কেহ কাহাকেও দেখে না—দস্যুদল নির্ভীক ভাবে ডাকাতি করে।

এজন্য ঐ খালের নাম ডাকাতের খাল। ডাকাতের খালের এক পাশে একটি বর্ধিষ্ণু গ্রাম। গ্রামে বাস করেন নিতাই বণিক। খুব ধনী, জাতিতে তন্তুবায়, সূতার ও তূলার কারবারে অনেক টাকা সঞ্চয় করিয়াছেন। লোকে বলে কোটি টাকা। কলিকাতাতে আড়ত আছে, কাশিমবাজারেও আছে! যে গাঁয়ে নিতাইয়ের বাড়ী, সেই গাঁয়ের নাম পলসোনা। সেখানে অনেক সোনার-বেনে এবং গন্ধবেনেরও বাস। সকলেই চাষবাস ও ব্যবসা করিয়া টাকা-কড়ি করিয়াছেন।

লোকে নিতাই বণিককে বলিত নিতাইবাবু। নিতাই লোকটি ছিলেন পরোপকারী। গাঁয়ের দুঃখী-দরিদ্রদের সাহায্য করিতেন; গোলার ধান বিলি করিতেন। লোকে তাঁহাকে ভালবাসিত ও শ্রদ্ধা করিত। সেবার পূজার সময় নিতাই বাড়ী চলিয়াছেন ডাকাতের খাল দিয়া। তাহার আদেশে তাঁহার নিজের নৌকাখানি আগে আগে চলিয়াছে, মাঝিকে বলিয়াছেন পথে মঙ্গলচণ্ডীর পূজা দিয়া যাইবেন। পেছনে রহিয়াছে নৌকা বোঝাই নানা জিনিসপত্র পূজার জন্য, দরিদ্রদের দানের জন্য—ধুতি, চাদর, গামছা, মণ্ডা, মিঠাই প্রচুর পরিমাণে।

মাঝি বলিল—পথটা ভাল নয় কর্তা। এ যে ডাকাতের খাল। কোথায় কোন্ বিপদ ঘটে, যদি নৌকো ঘিরে ফেলে! এগিয়ে যাওয়া কি ভাল হবে?

নিতাই হাসিয়া উত্তর করিলেন—'ভয় কিসের হে রামকানাই? এ খালে ত বরাবরই যাই। কই কোনদিন ত আমার নৌকোয় ডাকাতি হয় নি। চল ঐ বাঁকটার পরেই ত মঙ্গলচণ্ডীর মন্দির। সঙ্গীরাও সব এসে পড়বে। জোরে নৌকো চালাও।

দাঁড়ি-মাঝিরা নৌকা চালাইল। ঝপ্-ঝপ্ শব্দে খালের জল উতলা হইয়া উঠিল।

মাঝি আরও জোরে নৌকা চালাইতে লাগিল।

দুই

মঙ্গলচণ্ডীর মন্দির। ঘন গাছপালায় ঢাকা নিবিড় বনের মধ্য দিয়া অতি সংকীর্ণ পথ! সেই পথে যাওয়া যায় মন্দিরের কাছে। গ্রামটিও বনভূমি। একটা প্রকাণ্ড বটগাছের পাশে ভগ্ন জীর্ণ প্রাচীরে ঘেরা প্রাঙ্গণের মধ্যে একটা ভাঙ্গা মন্দির। মন্দির দক্ষিণমুখো। কাঠের ভাঙ্গা সিংহাসনের উপর দশভুজা মহিষমর্দিনী মূর্তি। সিংহাসনের সম্মুখে একটি প্রস্তরের মূর্তি—নাম কপিলেশ্বর। লোকে বলে উজানিতে মঙ্গলচণ্ডী দেবী। তন্ত্রের মতে এই মঙ্গলচণ্ডী দেবীর মন্দির একটি পীঠস্থান। মন্দিরের এক কোণে রহিয়াছে রুধির-সিক্ত ভীষণ দীর্ঘ খড়্গ। মন্দিরপ্রাঙ্গণে হাড়িকাঠ। তাহার দুইদিকে রক্তের ধারায় সিক্ত কর্দমাক্ত মাটি।

কী ভীষণ নীরবতা! লোক নাই—লোকালয় নাই আশে পাশে। গভীর অন্ধকার রাত্রি। গাছপালায় স্থানটিকে আরও ভীষণ অন্ধকার ও ভয়যুক্ত করিয়া তুলিয়াছে। মন্দিরে পুরোহিত নাই। মন্দিরে ভাঙ্গা কপাট। একটা মাটির প্রদীপের ক্ষীণ আলোতে সেই মহিষমর্দিনী মূর্তিকে দেখাইতেছে অতি ভীষণা রক্তলোলুপা, যেন রক্তচক্ষু করিয়া দেবী বলিতেছেন—,রক্ত দে—রক্ত দে!

পূজা করিতেছে হারাণ বাগ্দী। ডাকাতের সর্দার সে। পূজার মন্ত্র কি জানি না—তবে পূজার উপচার বড় কম ছিল না। সে জয় মা কালী বলিয়া চীৎকার করিয়া মন্দিরপ্রাঙ্গণ ধ্বনিত করিয়া তুলিল! সঙ্গে সঙ্গে সেই নিবিড় বনে সেই ধ্বনি প্রতিধ্বনিত হইয়া উঠিল।

এমন সময় শোনা গেল লোকজনের শব্দ। দেখা দিল লণ্ঠনের আলো। সেই সংকীর্ণ খালের ধার দিয়া আগে আসিতেছিলেন নিতাইবাবু। গায়ে একখানি মাত্র উড়নি, সাদা থান ধুতি পরা, সৌম্যশান্ত মূর্তি।

সব চুপচাপ! যেন কোন লোকজন নাই। ডাকাতেরা লাঠি তলোয়ার সড়কি লইয়া মন্দিরের আশেপাশে বনের আড়ালে লুকাইয়া আছে। হারাণ সর্দার একটা মানুষের মাথার খুলির মধ্যে বলির রক্ত

লইয়া বাহিরে আসিয়া যেমন নিতাইর কপালে তিলক পরাইতে গিয়াছে অমনি ক্ষীণ আলোকে তাঁহাকে দেখিতে পাইয়া, দুই হাত পিছাইয়া চীৎকার করিয়া বলিল—কু—কু—কু।

বিস্মিত হইলেন না, ভীত হইলেন না নিতাইবাবু। যেন কিছু ঘটে নাই—সব ভয়, আতঙ্ক কিছুতেই ভীত না হইয়া দেবীর ধ্যান করিতে শুরু করিলেন; তারপর মাকে প্রণাম কবিয়া যেমন মাথা তুলিলেন—দেখিলেন তাঁহাকে ঘিরিয়া আছে একদল সশস্ত্র ডাকাত। ডাকাতদের হাতে লাঠি, তলোয়ার ও সড়কি। ভীষণদর্শন তাহাদের মূর্তি। মাথায় ভরা ঝাঁক্ড়া চুল। কালিমাখা মুখ, চক্ষু রক্তবর্ণ। সকলে নীরব। কাহারও মুখে কোন কথা নাই।

নিতাই বাবু এইবার ভয়ে কাঁপিতেছিলেন। পূর্বের সাহস আর তাঁহার ছিল না। এমন সময় হারাণ বাগ্দী—দলের সর্দার—মানুষের মাথার খুলিতে ভরা রক্ত লইয়া আসিয়া দাঁড়াইল। কি ভয়ংকর তাহার মূর্তি! মাথাভরা জটার মত লম্বা চুল, দাড়ি-গোঁফে ঢাকা মুখ। রক্তচক্ষু ঠিক জবাফুলের মত। কালিমাখা ভীষণ মুখ। দীর্ঘ দেহ। বলিষ্ঠ গঠন।

নিতাই কম্পিতকণ্ঠে বলিলেন—কে তোরা?

সকলে জোরালো স্বরে বলল—আমরা ডাকাত!

—ডাকাত ডাকাত! তোমরা কি আমায় মেরে ফেলবে?

এমন সময় আগাইয়া আসিল হারাণ বাগ্দী, কহিল—না মারব না। দৈব আপনাকে রক্ষা করেছে—মায়ের মন্দিরে এসেছেন, নইলে এতক্ষণে শেষ হয়ে যেতেন।

—আমার সঙ্গীরা—

—তাদের নৌকোর মালপত্তর এতক্ষণে লুঠপাট হয়ে গেছে। সব এখানে এসে পৌছবে।

—কেন—কি তাদের অপরাধ?

—অপরাধ নয়। আমাদের প্রয়োজন আছে। তাই লুঠ করেছি।

হারাণ সর্দার এইবার নিতাইবাবুর কাছে আসিয়া বলিল—ভাল করে চেয়ে দেখ বাবু, আমায় চিনতে পার?

—চিনতে—তা—ঠিক—না—হাঁ পেরেছি।—তুই—তু—মি—তুমি—হারাণ?

—হাঁ, আমি হারাণ!

—তুমি ডাকাত?

ভীষণ অট্টহাসি হাসিয়া হারাণ কহিল—হা—হা আমি ডাকাত! কিন্তু আমাকে ডাকাত করেছে কে? তুমি নিতাইবাবু!

ডাকাতেরা একে একে আসিয়া নিতাইর গা ঘেঁষিয়া দাঁড়াইল।

—আমি—আমি—

—হাঁ তুমি! মনে পড়ে বাবু, তোমার বড় ছেলে যখন গঙ্গায় ডুবে যাচ্ছিল, কে তাকে বাঁচিয়েছিল? মনে পড়ে? না—না—তোমরা বড়লোক! সব কথা ভুলে যাও। কোম্পানীর গুদামে হাজার হাজার টাকা পৌঁছে দিয়েছি—আমি হারাণ সর্দার! মনে পড়ে বাবু?

নিতাই নীরব।

সেই তুমি বিনা দোষে—সেবার খাজাঞ্চিখানার সিন্দুক হতে এক হাজার টাকার একটা তোড়া পাওয়া যায় নি বলে আমাকে চোর বলে সারা গায়ে মেরেছিলে কোড়ার বাড়ি! এই দেখ এখনও সেই দাগ! শুধু কি তাই? কোতোয়ালের হাতে দিয়ে আমাকে কয়েদখানায় পাঠিয়েছিলে। কয়েদখানার দেওয়াল টপকে পালিয়ে এসেছিলাম, তাই রক্ষে; নইলে সেখানেই প্রাণ যেত। এই দেখ, কোড়ার দাগ, এই দেখ আমার ভাঙ্গা চোয়াল। তুমি সেই নিতাইবাবু! এখন আমি—

কাঁদিয়া ফেলিলেন নিতাই বাবু। করুণকণ্ঠে বলিলেন—আমাকে মাপ করো হারাণ!

—তোমায় মেরে কন্ধকাটা করে খালে ভাসিয়ে দেব—আমাদের ডাকাতের খালে!—চীৎকার করিল হারাণ সর্দার।

হা-রে-রে-রে শব্দ করিয়া সব ডাকাত তলোয়ার উঁচু করিল।

একটু পরে হারাণ জিজ্ঞাসা করিল—বাবু, ভদ্রলোক বেইমান হয়, চোর হয়, জোচ্চোর হয়, গরীবের খাবার কেড়ে নেয়, মিথ্যা করে

চোর বলে ধরিয়ে দেয়, কিন্তু গরীব তা করে না। তোমরা কাকেও বিশ্বাস করতে জান না !—

নিতাই কাঁদিতে কাঁদিতে কহিলেন—আমায় কি মেরে ফেলবে হারাণ ?

হারাণ বাগ্দী আঙ্গুল তুলিয়া ডাকাতদের যেমন ইসারা করিল, তাহারা অমনি সরিয়া দাঁড়াইল নিতাইর পাশ থেকে।

হারাণ বলিল—কালু, নিতাইবাবুর নৌকোর লুঠের জিনিস সব এনেছিস্ ?

—হাঁ সর্দার !

—যা, সব গুদামঘরের কাছে জড় কর।

লোকটি চলিয়া গেল। ডাকাতের দল নিতাইবাবুকে লইয়া মন্দির হইতে বাহিরে আসিল।

তিন

বাঁশী বাজিল। দামামা বাজিল ডিম্-ডিম্। ঢাক বাজিল জোরে।

বনের এক প্রান্তে মন্দিরের অল্প দূরে বিস্তীর্ণ মাঠ ! সেই মাঠের পাশে একটা বিরাট বটগাছের নীচে আসিয়া বসিল হারাণ সর্দার !

ক্রমে ফর্সা হইল। পূব আকাশ লাল হইয়া উঠিল। পাখীরা ডাকিতে লাগিল। আবার বাঁশী বাজিল। দেখিতে দেখিতে পিঁপড়ার সারির মত পুরুষ ও নারী—শিশু-বালক-কিশোর—ছোট বড় সব আসিতে লাগিল।

হারাণ বাগ্দী প্রত্যেককে ডাকাতদের হাত দিয়া এবং নিজের হাতে বিলাইতে লাগিল—কাপড়, টাকাকড়ি, চাল, ডাল—তাহাদের প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র। কঙ্কালসার এসব ভিখারী-ভিখারিণীর দল নিতাইবাবু বুঝি আর আগে দেখেন নাই। দেখিলেন পরণে কাপড় নাই, মাথায় তেল নাই, কি অভাব—কি দুর্দশা দেশের লোকদের।

নিতাইবাবু বসিয়া বসিয়া এই সব দেখিতেছিলেন। এই সব দেখিয়া কাঁদিয়া ফেলিলেন। এই তাঁহার দেশের লোক, এত গরীব—এত অভাগা। আর কি অন্যায় করিয়াছেন তিনি এই হারাণ বাগ্দীর

উপর। বিনা দোষে কি বেদনা দিয়াছেন। নিতাই মনে মনে একথাই বিশেষ করিয়া চিন্তা করিতেছিলেন—কে বড়—ধনী ব্যবসায়ী নিতাইবাবু—না হারাণ বাগ্দী—ডাকাতের সর্দার?

একে একে অন্যান্য ডাকাতেরা নিমেষে বনের মধ্যে অদৃশ্য হইল। সেইখানে রহিল শুধু ডাকাতের সর্দার, নিতাইবাবু আর চারজন ডাকাত!

চার

—বাবু এইবার।

—কি করবে আমায়?

—মার কাছে বলি দেব।…বলিয়া হারাণ হাসিল। আবার উচ্চকণ্ঠে—হা—হা—হা। সে কি ভীষণ অট্টহাসি।

নিতাইবাবু করুণকণ্ঠে কহিলেন—তাই দাও!

—সে কি কথা! আমরা গরীব, মুখ্যু-সুখ্যু লোক—কিন্তু বেইমান নই।….কালু!

—সর্দার!

—বাবুর চোখ-মুখ বেঁধে বনের সীমা পার করে ওঁর গাঁয়ের পথে খালের মধ্যে যে নৌকা আছে তাঁতে রেখে আয়! ওঁর সঙ্গের মাঝি-মাল্লাদের ছেড়ে দে।

—আমাকে ছেড়ে দিলে—হারাণ?

—কি করবো আপনাকে মেরে?

—তুমি অপরাধ ভুলে যেয়ো হারু!

—ভুলে গেছি বাবু, ভুলে গেছি। তবে একটা কথা বলি বাবু, দারোগা পুলিশ করবেন না—তা'হলে বিপদে পড়বেন। আর একটা কথা বলছি বাবু, এই আমাদের মত ছোটলোক গরীব-দুঃখীদের ভুলবেন না। অনেক টাকা রোজগার করেছেন, আরো করবেন, কিন্তু এদের কথা মনে রাখবেন! প্রণাম হই বাবু, আপনি যে আমার মনিব। ডাকাত হয়েছি বলে ত আপনার উপকার ভুলতে পারবো না—যতদিন বেঁচে থাকবো।

নিতাইবাবু হারাণ বাগ্দীকে বুকে জড়াইয়া ধরিলেন ; বলিলেন—বাবা ! আমি প্রতি বৎসর তোমার হাত দিয়ে এমনি করে আমার কাঙ্গালী মা-ভাইবোনদের অন্ন বিলাবো, কাপড় দেবো। তুমি নিজের হাতে বিলিয়ে দেবে তাদের মধ্যে—মায়ের নাম করে।

কতদিন চলিয়া গিয়াছে। যে বনভূমিতে নিতাইবাবু গরীব-দুঃখীদের দান করিতেন, সেই স্থানের নাম হইয়াছে নিতাইগঞ্জ। কে না জানে নিতাইগঞ্জের হাটের নাম ?

আজ লোকে নিতাইবাবু ও হারাণ বাগ্দীর নাম ভুলিয়া গিয়াছে। কেবল স্মৃতিতে বাঁচিয়া আছে নিতাইগঞ্জের হাট আর শীর্ণকায় ডাকাতের খাল !



অতিথির হাতে প্রাণ রক্ষা

এক

কয়েক বৎসর আগে গিয়াছিলাম বর্ধমান জেলার পূর্বস্থলী গ্রামে। গঙ্গার তীরে বৃহৎ পল্লী। গঙ্গা বর্ষার শেষে ক্রমে ক্রমে ক্ষীণসলিলা হইয়া পড়ে এবং গ্রীষ্মের দিকে অনেক জায়গায় শুকাইয়া যায়, লোকে তখন হাঁটিয়া পারাপার হয়। আমি যখন পূর্বস্থলী গিয়াছিলাম, তখন বাহির হইতে কোন লোক-সমাগম নাই, বাংলাদেশও বিভক্ত হয় নাই। স্টেশন হইতে গ্রাম দূরে। বড় গ্রাম। আমার সঙ্গীর বাড়ী নদীয়া—নবদ্বীপ শহর। তিনি বলিলেন, চলুন গ্রামের ভিতর। স্থানীয় একজন বৃদ্ধ মুসলমান হইলেন সঙ্গী। যে গ্রামের দিকে চলিলাম, সেই গ্রাম পূর্বস্থলীর অনেক দূরে। সে গ্রামের নাম আজ আমার মনে নাই।

মাঠ ছাড়াইয়া আসিলাম পল্লীপথে। অপ্রশস্ত পল্লীপথ, পথ উঁচুনীচু, দুইদিকে গভীর বাঁশবন, আমবাগান। বট ও অশ্বত্থ এবং পাকুড় গাছ। দক্ষিণে ও বামে দুই দিকেই বন ক্রমশঃ গভীর হইয়া আসিতেছিল। ঘরবাড়ী বড় একটা চোখে পড়িতেছিল না। ভগ্নজীর্ণ দালানকোঠা। কোথাও প্রাচীর ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে। ছাত নাই, গায়ে বুনোগাছের চারা গজাইয়া অন্ধকার করিয়াছে। সাপ, গোসাপ ও শৃগালের নিরাপদ বাসস্থান। বড় বড় দীঘি-সরোবর নানা জলজ উদ্ভিদে ঢাকা, শৈবালদলে পরিপূর্ণ।

আমরা দুইদিকে ভগ্নজীর্ণ বাড়ীঘর, কুঁড়ে, সংকীর্ণ পথ, কাঁটাগুল্ম ঝোপঝাড় পার হইয়া চলিতে চলিতে অগ্রসর হইয়া দেখিতে পাইলাম রাস্তার বাঁ দিকে একটি প্রকাণ্ড বাড়ি। বাড়ির চারিদিকে প্রাচীর। প্রাচীর কোথাও ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে, কোথাও খাড়া আছে। গাছগাছড়া ঢাকিয়া ফেলিয়াছে। একটি ভাঙ্গা সিংহ-দরজা, তাহার একদিকে ইট পড়িয়া আছে। প্রকাণ্ড একটা দীঘি। তাহার পারে শিবমন্দির, শিবমন্দিরে শুধু গৌরীপট পড়িয়া আছে। মুসলমান ভদ্রলোক বাড়ীর ভিতর আগে আগে চলিলেন। বাহিরে পূজার দালান, নাটমন্দির, অতিথিশালা পড়িয়া আছে : এই সব দেখাইয়া বলিলেন, আসুন বাড়ির ভিতর। বিরাট চকমিলান বাড়ি। এক বৃহৎ অট্টালিকা। জানালা-দরজা ভাঙ্গা। বাহিরের বৃহৎ একটি ঘরে কোন যুগের জীর্ণ শীর্ণ সতরঞ্চের অতি সামান্য অংশ পড়িয়া আছে। বাড়ীর নীচের তলে বড় বড় ঘর। সিঁড়ি ভাঙ্গা, কোনরূপে আমরা ধূলো-বালিতে ভরা দ্বিতলে উঠিলাম। আমরা এক পাশে বসিয়া বাহিরের দিকে চাহিয়া দেখিলাম, নীচে প্রকাণ্ড বড় রন্ধনশালা আর যতদূর চোখে পড়ে একটা বড় আমবাগান। হঠাৎ একটা সাপ প্রাঙ্গণের মধ্য দিয়া হিস্-হিস্ করিয়া চলিয়া গেল। গুটিকয়েক শেয়াল মানুষের পদশব্দে দৌড়াইয়া পলাইল। নির্জন নিঝুম এ পুরী, যেন ভূতের বাড়ী। কয়েকটা নারকেল গাছ মাথা উঁচু করিয়া দাঁড়াইয়া আছে। আমার সঙ্গী ও আমি ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছিলাম। এখানে এই পরিত্যক্ত জনহীন নির্জন পুরীতে, চারিদিকের একটা ভয়ানক পরিবেশের মধ্যে দিনের বেলাও ভয়ের সঞ্চার হইতেছিল।

বন্ধু বলিলেন—চলুন।

আমি বলিলাম—বেলা হয়েছে, এবার যাওয়াই ভাল।

স্থানীয় সেই বৃদ্ধ মুসলমান ভদ্রলোক বলিলেন—আর একটু কষ্ট করতে হবে, চলুন বাড়ির অন্দরের দিকে।

কোন রকমে সেই ভাঙ্গা সিঁড়ি দিয়া নীচে নামিয়া আসিলাম। সম্মুখে বিরাট বাঁধান চত্বর। ইট-সুরকি বাহির হইয়া পড়িয়াছে। গভীর গর্ত। ভাঙ্গা দরজার ভিতর দিয়া চলিলাম ভদ্রলোকের পেছনে।

দুইদিকে রান্নার দালান। শিল-নোড়া, ভাঙ্গা হাঁড়ি-কড়াই পড়িয়া আছে, মরচে ধরা। একটা ঘর—সে প্রায় পঞ্চাশ-ষাট হাত লম্বা, সেইটা ছিল খাবারের জায়গা। সে ঘরের ছাদ নাই। কুলুঙ্গিতে কালো ধোঁয়ার দাগ। তুলসী মঞ্চ, শুষ্ক ইঁদারা, আরও দূরে ঢালু জায়গা,—একটু পরে খিড়কীর পুকুর। পুকুর বেশ বড়, কিন্তু আগাছা উদ্ভিদে পূর্ণ। পুকুরে লম্বা লম্বা বুনো ঘাস জন্মিয়াছে। একটা ঘরের ভিতর পড়িয়া আছে মরচে-পড়া প্রকাণ্ড খড়্গ, সামনে হাড়িকাঠ। সেই প্রকাণ্ড হাড়িকাঠের একদিক জরাজীর্ণ আর একদিক ঠিক আছে তাহার পাশেই বিরাট খাঁড়া। মরচে-পড়া সেই খাঁড়া।

—দেখলেন ত বাবুমশাই!

—কি বলতে চাও তুমি?

—বাবু এখানেই হয়েছিল সর্বনাশ! এখনও রাতের বেলা, সন্ধ্যে রাতে মানুষ দেখে ভূত! এসেছেন ত এই দিন-দুপুরে, তাও লোকজনের চলাচলতি নেই। একথাটা সত্য। লোকজনেরা এ বাড়ীর পাশ এড়িয়ে মাঠের পথে চলে।

একে একে সব দেখাইয়া বৃদ্ধ নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিল—বাবু দুনিয়ায় ত মানুষের এমনি হয় পরিণাম। এত বড় জমিদারের বাড়ী, তার দেখুন কি দুর্দশা, কি পরিণাম।

একটি কথাও মিথ্যে নয়। গাছপালা, দীঘি-পুকুর, দেয়াল সব যেন হা-হা করিতেছে! বিষণ্ণ-মনে ফিরিয়া আসিলাম বন্ধুর বাড়ি।

সন্ধ্যার সময় আসিলেন মুসলমান ভদ্রলোক এবং বলিতে আরম্ভ করিলেন সেকালের এক ভয়ানক সত্য কাহিনী। সে কথাই বলিতেছি।

দুই

মুসলমান ভদ্রলোকের কথিত বিবরণ বলা হইতেছে—

সে একশ' দেড়শ' বছর আগে ঐ গ্রামের চৌধুরীপাড়ায় বাস করিতেন শম্ভুনাথ চৌধুরী। বিরাট ছিল তাঁহার জমিদারী। ধনে-মানে সম্পত্তিতে তিনি ছিলেন মস্ত বড় লোক। অতিথি-অভ্যাগত দিন-

রাত্রি আসাযাওয়া করিত, বাড়ি নিত্য করিত গম্‌গম্‌। শম্ভুনাথ ছিলেন পরম বৈষ্ণব। নিত্য পূজাপার্বণ লাগিয়াছিল তাঁহার বাড়িতে। গানবাজনা, কীর্তন যেমন হইত, তেমনি গ্রামের দুঃখী-দরিদ্রেরা পেট ভরিয়া দুই বেলা খাইতে পাইত। যেমন ছিলেন কর্তা, তেমনি ছিলেন মা ঠাকুরানী। অতিথিসেবা না হইলে কর্তা ও গৃহিণী কেহ খাইতেন না। একদিন সন্ধ্যার পর তাঁহার বাড়িতে আসিলেন এক বৃদ্ধ ও তাঁহার যুবক পুত্র। দুই অতিথি।

চৌধুরী মহাশয়ের বাড়ির কাছে যখন তাঁহারা আসিলেন, তখন রাত্রি প্রায় দুই দণ্ড হইয়াছে।

যুবক পুত্র বলিল—বাবা এ ত বেশ বড়লোকের বাড়ি, আজ রাত্রের মত এ বাড়িতে অতিথি হলে হয় না? কি বলেন?

ক্লান্ত বৃদ্ধ অনেকটা পথ হাঁটিয়া আসিয়াছিলেন, বলিলেন—তা ত হয় বাবা। কিন্তু এ অঞ্চলের সম্বন্ধে নানা দুর্নামও ত আছে, অনেক সময় জমিদারও ডাকাত হন—যদি এ ডাকাতের বাড়ি হয়?—কি করে বুঝবো।

পুত্র বলিল—কাছে ত আর গ্রাম নেই, রাত্রিও বেড়েই চলেছে। বাঘের মুখে পড়ার চেয়ে এ বাড়িতে অতিথি হলে মন্দ কি? তারপর এমনও হতে পারে যে, পথে ঠেঙ্গাড়ের হাতেও পড়তে পারি।

বৃদ্ধ উত্তর করিলেন—কথাটা ঠিক। সম্বল ত মাত্র ভিক্ষার এক হাজার টাকা। তা অবশ্যই বেশ শক্ত করেই থলেতে বেঁধেছি। এ টাকাটা গেলে মেয়ের বিয়ে দেব কি করে? কি জানি জগদম্বার মনে আছে!

—ওঃ—দিদির বিয়ের কথা বলছো? সে হবে। কেউ নেবে না এ টাকা।

দুইজনে এইরূপ কথা বলিতে বলিতে একেবারে ফটকের কাছে আসিয়া পড়িলেন। বৃদ্ধের কাঁধে একটি সেতার ঝুলানো, বাঁ হাতে লাঠি। যুবকের হাতে পোটলা-পুঁটুলি। বৃদ্ধের বয়স প্রায় সত্তরের কাছাকাছি! যুবকের বয়স কুড়ি-পঁচিশ হইবে—বেশ বলিষ্ঠ।

একজন প্রৌঢ় গৌরবর্ণ সুপুরুষ ভদ্রলোক ইঁহাদের লক্ষ্য করিতে-

ছিলেন এবং ফটকের কাছে আসিয়াও তাঁহাদিগকে ঢুকিতে ইতস্ততঃ করিতে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—মশাইদের কোথায় যাওয়া হবে ?

—আজ্ঞে—মেড়পাড়া। আমরা ব্রাহ্মণ—এইটি আমার পুত্র। পৌঢ় ভদ্রলোক বলিলেন—আমার পরম সৌভাগ্য যে আপনাদের দর্শন পেলুম। আমার আজ অতিথি সেবা হয় নি। আসুন !

মহাশয় কি এই বাড়ির কর্তা ?—জিজ্ঞাসা করিলেন ব্রাহ্মণ।

আজ্ঞে হাঁ। আসুন !—ভদ্রলোক পরম সমাদর সহকারে অতিথি দুইজনকে লইয়া আসিলেন এবং অতিথিশালার একটি বৃহৎ ও পরিচ্ছন্ন কক্ষে তাঁহাদের রাত্রিতে থাকিবার ব্যবস্থা করিয়া দিলেন। ভৃত্য আসিয়া হাত-মুখ ধোয়ার জল দিল এবং রান্নাবান্নার ব্যবস্থা করিয়া দিল।

বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের নাম বাণীনাথ তর্কালঙ্কার। পরম পণ্ডিত মানুষ কন্যাদায়ের জন্য অর্থ সংগ্রহ করিতে ভিক্ষায় বাহির হইয়াছিলেন। তর্কালঙ্কার মহাশয়ের নাম যশ ছিল, কাজেই শিষ্য ও অন্যান্য ধনী মহাজন ও ভক্তদের কাছ হইতে যে হাজার খানেক টাকা সংগ্রহ করিতে পারিয়াছিলেন, তাহার জন্যই চিন্তিত ছিলেন পিতাপুত্র। পাছে ডাকাতে কেড়ে নেয়। তাঁহারা ভাবিলেন এ বাড়ি কখনও ডাকাতের বাড়ি নয় !

চৌধুরী মহাশয়ের ভক্তি শ্রদ্ধা ও বিনয়ে মোহিত হইয়াছিলেন পিতা-পুত্র। প্রচুর আয়োজন করিয়া দিয়াছিল ভাণ্ডারী। রান্নাবান্না শেষে পরম পরিতোষের সহিত আহার করিয়া পিতা-পুত্র ঘরে আসিলেন। পুত্র শুইয়া পড়িল। তর্কালঙ্কার টাকার তোড়াটা আরও শক্ত করিয়া থলেতে বাঁধিয়া বালিশের নীচে রাখিয়া বসিলেন বাণীনাথ। তিনি সেতারের সুরে সুরে গান ধরিলেন। প্রসাদী সুরে—

রইলি না মন আমার বশে,
ত্যজে কমলদলের অমল মধু, মত্ত হলি বিষয়-রসে।

গানের সে সুরলহরী গভীর নিশীথে দিকে দিকে সুরের মূর্ছনা জাগাইয়া দিতেছিল। বাড়ির ভিতরে যেখানে শম্ভুনাথ চৌধুরী

শুইয়াছিলেন সেই সুরে তাঁহাকে বিভ্রান্ত করিয়া তুলিল। তিনি আর শুইয়া থাকিতে পারিলেন না। বাহিরে সেই অতিথিশালায় ছুটিয়া আসিলেন তর্কালঙ্কারের পাশে। করযোড়ে কহিলেন—ধন্য আপনি। আমাদের মানসম্ভ্রম, অর্থলোভ ও বিষয়-বাসনা আর গেল না!

গল্প চলিতেছে, এমন সময় আবার দুইজন অতিথি আসিল। এইবারও একজন বৃদ্ধ এবং একজন যুবক। বৃদ্ধের হাতে প্রকাণ্ড একটা লাঠি আর উভয়ের কাঁধে ঝুলানো প্রকাণ্ড তীর-ধনুক।

চৌধুরী মহাশয় একটু ভীত হইয়া পড়িয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—তোমরা কারা? তাঁহার মনে হইয়াছিল বুঝি ইহারা ডাকাত!

বৃদ্ধ কহিল—বাবুসাব, হামলোক শিকারী হ্যায়, বহুৎ দূর যানে হোগা। আপ্‌ বড়া আদমি, আজ রাতমে আপকা কুঠিমে রহেনে মাঙ্গতা। যুবককে দেখাইয়া বলিল—ও হামারা লেড়কা, ইস্‌কো নাম মহাবীর। ভারি জব্বর শিকার খেলনেওয়ালা। জয় হনুমানজী! জয় রামজী!

এই দুইজন নবাগত অতিথিও আশ্রয় পাইল। তাহারা ডাল, রুটি খাইয়া রাত্রিতে অতিথিশালার একটি ছোটঘরে আশ্রয় পাইল। তর্কালঙ্কারের সঙ্গে তাহাদের নানা কথা হইল। তারপর তর্কালঙ্কার শুইয়া পড়িলেন। শম্ভু চৌধুরীও অন্দরে চলিয়া গেলেন।

তিন

রাত্রি গভীর হইয়াছে। চারিদিকে স্তব্ধভাব। বাতাসে গাছের পাতা সর-সর শব্দে দুলিতেছে! দেউড়িতে বরকন্দাজেরা ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। এমন সময় অনেকগুলি মশাল জ্বলিয়া উঠিল। একদল দস্যু অন্দর মহলের দিক হইতে প্রাচীর ডিঙ্গাইয়া ঢুকিয়া পড়িল। তাহাদের বিকট হা—হা—হা অট্টহাসিতে হইল বিভীষিকার সৃষ্টি! প্রত্যেকের হাতে বর্শা ও তলোয়ার। বরকন্দাজ ও পাহারাওয়ালারা ছুটিয়া আসিল, কিন্তু এত বড় দস্যুদলের আক্রমণে কি করিতে পারে বিশ-পঁচিশজন বরকন্দাজ!

দস্যু-সর্দারের হুকুমে একদল দস্যু শম্ভু চৌধুরী মহাশয়ের শয়ন-কক্ষে প্রবেশ করিতে দোতলার সিঁড়ি দিয়া চাপা দরজা ভাঙ্গিয়া উপরে উঠিতে শুরু করিতেছিল। ঝন্‌ঝন্‌ শব্দে কপাট ভাঙ্গিতেছিল আর বরকন্দাজদের বর্শা ছুঁড়িয়া মারিতেছিল।

এমন সময় বৃদ্ধ শিকারী তাহার যুবক পুত্রকে ডাকিয়া বলিল—বাচ্চা, ক্যায়া দেখতা, ছোড় তীর!

বীর-বিক্রমে লাফাইয়া উঠিল মহাবীর। অদ্ভুত শিক্ষা বৃদ্ধ শিকারীর ও যুবকের। তাহারা গোপনে একটা দরজার আড়ালে থাকিয়া মুষলধারা বৃষ্টির মত তীর ছুঁড়িতে লাগিল। অব্যর্থ তাহাদের তীরের সন্ধান। তীরেব আঘাতে দস্যুরা একে একে মাটিতে পড়িতে লাগিল। একটা প্রবল উত্তেজনা ও ভয়ে ডাকাতেরা পলাইতে আরম্ভ করিল। যে ডাকাতেরা চৌধুরীমহাশয়ের ঘরে ঢুকিতে দ্বিতলের দিকে ছুটিতেছিল, তাহাদের একজনও প্রাণে বাঁচিল না।

অতিথিশালার দিকে কয়েকজন ডাকাত যেমন পলাইবার মুখে ছুটিয়া আসিতেছিল বৃদ্ধ শিকারী এমন কৌশলে তাহাদিগের দিকে তীর ছুঁড়িতেছিল যে, সকলেই আহত হইয়া পড়িতেছিল, কিংবা মরিতেছিল!

পরদিন ব্রাহ্মণ ও ব্রাহ্মণের পুত্র চৌধুরীমহাশয়কে আশীর্বাদ করিয়া চলিয়া গেলেন।

দারোগা পুলিশ আসিল। আহত ব্যক্তিদের তাহারা শহরে চালান দিল। অনেক ডাকাত ধরা পড়িল। শিকারী বৃদ্ধ ও তরুণ—পিতা ও পুত্র, কোম্পানীর কাছ হইতে পুরস্কার পাইল।

এই কাহিনী শেষ করিয়া মুসলমান ভদ্রলোক বলিলেন—'শম্ভু চৌধুরী মহাশয় শিকারী পিতা ও পুত্রকে তাঁর বাড়ির রক্ষকরূপে নিযুক্ত করলেন। কিছুদিন বেশ নিরাপদে কেটে গেল। কোন দস্যু-ডাকাত আর এ অঞ্চলে এর মধ্যে ডাকাতি করতে আসে নি। কিন্তু সেই যে খড়্গ পড়ে আছে দেখলেন, সেখানে একদিন হয়েছিল ভীষণ এক ঘটনা! সে বড় করুণ! একজন তান্ত্রিক সাধু ঐ যে

ভগ্নজীর্ণ কালীমন্দির দেখলেন, সেখানে পূজা-অর্চনা করতেন। শ্মশানে বসে করতেন সাধনা! একদিন সেই নিষ্ঠুর তান্ত্রিক গভীর নিশীথে এক চণ্ডাল বালককে চুরি করে এনে বলি দিয়ে শবের উপর বসে উপাসনা করেন! পরদিন ভোরে চৌধুরীমহাশয় জানতে পারলেন এবং নিজের চক্ষে দেখলেন সেই ভীষণ দৃশ্য! দেখলেন তান্ত্রিক কালান্তক! বালকের শব শ্মশানে ভূলুণ্ঠিত! শিউরে উঠলেন। চৌধুরী ভাবলেন, আর নয়—আর ত সংসারে থাকা চলে না!'

সংসার ছাড়িয়া চৌধুরী হইলেন দেশত্যাগী। পুত্র থাকিতেন পশ্চিমে বেরিলি শহরে! একমাত্র পুত্র কমিশরিয়টের অফিসে চাকরি করতেন, তাঁকে লিখলেন—বাবা! তোমার সংসার, তোমার সম্পত্তি বুঝে নাও, আমাকে বিদায় দাও, সংসার থেকে—বৃন্দাবনে যাব!

মাস যায়, বছর যায়, কোন উত্তর নাই।

যে পুত্র প্রতি মাসে পত্র দিতেন, সে পুত্র এমন একটি ঘটনা জানিয়াওবাবা-মায়ের চিঠির উত্তরদিলেন না। ফিরিয়াআসিলেন না।

বৃদ্ধ একেবারে ভাঙ্গিয়া পড়িলেন। কিছুদিন পরে পতি-পত্নী দুইজনে চিরদিনের মত সব ছাড়িয়া চলিলেন বৃন্দাবনে। সেই বৃদ্ধ শিকারী ও তার পুত্র মহাবীর হইল তাঁহাদের সাথী।

তাহার পর বুঝলেন বাবুমশাই—এই বাড়ীর হয়েছে এই হাল। পাশ দিয়ে কেউ যায় না। দেখে ভীষণমূর্তি তান্ত্রিক খাঁড়া কাঁধে করে নরবলি দিতে ছুটেছে; আর দেখে হা-রে-রে-রে শব্দ করে মশাল জ্বেলে ডাকাতেরা বাড়ি লুটছে।

আপনারা কি বিশ্বাস করেন এসব? আমরা কিন্তু করি।

সেই পতিত বাড়ী—সেই ভীষণ দৃশ্য আমাদের মনে জাগাইয়া দিয়াছিল ভীষণ আতংক।

আমরা নীরব রহিলাম।



মনোহর ডাকাত

এক

দক্ষিণ কলিকাতার একটি বিখ্যাত পথের নাম মনোহরপুকুর রোড। আজকাল সেখানে বড় বড় লোকের বাড়ি। সুপ্রশস্ত রাজপথ, শৌখিন পল্লী। প্রায় দুইশত বৎসর আগে এ অঞ্চল কেমন ছিল সে-কথা সকলের ধারণার অতীত। চারিদিকে ঘন বনজঙ্গল, খাল, বিল, জলা, হোগলা বন। লতাগুল্মে কাঁটা-বনে চারিদিক আবৃত। পথ নাই, ঘাট নাই, লোকের বসতি বিরল। একদিকের একটা ছোটখালের মধ্য দিয়া চলিত সালতি নৌকা। সুন্দরবনের যাত্রীরা কাঠ কাটিতে, মধু সংগ্রহ করিতে এবং শিকার করিতে যাইত এই পথে। বনের মাঝে নিরিবিলি স্থানে—সকলের অজানা গোপন স্থানে বাস করিত চোর-দস্যু ও ডাকাতের দল। জেলে, বাগ্দী, বাউরীরা এবং জংলী লোকেরা এখানে থাকিত। কেহ মাছ ধরিতে যাইত আদি গঙ্গায়, গঙ্গায় ও আশেপাশের ঝিলে বিলে। এমন দুর্গম বনমধ্যে বাস করিত—একজন বিখ্যাত ডাকাত। তাহার নাম ছিল মনোহর বাগ্দী।

মনোহরও ছিল দুর্দান্ত ডাকাত। সেকালে পুলিশের এত হাঙ্গামা ছিল না। কোম্পানীর আমল ও শাসন আরম্ভ হয় নাই। পলাশীর যুদ্ধের শেষে দেশে চলিতেছিল অরাজকতা, অভাব, দুর্ভিক্ষ প্রভৃতি নানা অশান্তি। সে-সময়ে দস্যু-ডাকাতদের অত্যাচারে মানুষের প্রাণ

বাঁচানো ছিল দায়! একদিকে বাঘ, ভালুক, গণ্ডার, সাপ, শূকরের তাড়া, অন্য দিকে ঠেঙ্গাড়ে, দস্যু প্রভৃতির ভয়ে লোকের ছিল আতঙ্ক।

সেকালের কালীঘাটের কালী-দর্শনে আসিত দক্ষিণ হইতে বহু স্ত্রী-পুরুষ, বালক-বালিকা। নিবিড় বনপথে কিংবা আদিগঙ্গা দিয়া আসিত নৌকাপথে কালীঘাটের কালী-দর্শনের জন্য। বনের মধ্য দিয়া ছিল সংকীর্ণ পথ—সে পথে আসিত যাত্রীর দল।

মনোহর বাগ্দী প্রতিদিন সন্ধ্যার পর কিংবা গভীর রাত্রিতে কখনও শহরের বসতির দিকে কিংবা নৌকায় করিয়া দলবল লইয়া যাইত—উত্তরপাড়া, চন্দননগর, বাঁশবেড়িয়া, ত্রিবেণী, নদীয়ার দিকে! তখন ঐসব অঞ্চলের ডুমুরদহ, গুপ্তিপাড়া প্রভৃতি ছিল ডাকাতদের আড্ডা। ডাকাতরা সব একত্র হইয়া—বিভিন্ন দলের সর্দারেরা পরামর্শ করিয়া কোথায় কোন্ অঞ্চলে ডাকাতি করিলে সুবিধা হইবে সেদিকে ভিন্ন ভিন্ন দল পাঠাইয়া দিত। তাহাদের অদ্ভুত মন্ত্রগুপ্তি আর এমনই একটি ব্যবস্থা ছিল যে, খুব কম সময়েই লুণ্ঠিত মালের খবর বাহিরের লোকেরা জানিতে পারিত। প্রত্যেক সর্দার নিজ নিজ দলের লোকদের লুণ্ঠিত মাল সমানভাবে ভাগ করিয়া দিত।

এই নিবিড় বনে ছিল মনোহরের আস্তানাই বল, আর আড্ডাই বল, যাহা ইচ্ছা বলিতে পার! বাড়িতে দুইখানি ছিল মাটির দেওয়াল দেওয়া ঘর। ঘরে খড়ের ছাউনি। মনোহরের স্ত্রী ছিল না। এক বুড়ি পিসি তাহার রান্নাবান্না করিত। বাড়ির কর্ত্রী ছিল সে। তাহার বাড়ির অল্প দূরে ছিল ছোট্ট একটি ভাঙ্গা মন্দির, পাষাণী কালীমূর্তি! মূর্তিটি আকারে ছোট হইলেও অতি ভীষণদর্শনা ছিল। ডাকাতেরা এই কালীমূর্তির নাম দিয়াছিল কঙ্কালমালিনী। কোন অলংকার ছিল না সেই মূর্তির অঙ্গে—দেবী ছিলেন আয়ুধভূষিতা, মুণ্ডমালা-বিভূষিতা এবং তাহার হাতে দেওয়া হইয়াছিল, নরবলি দেওয়া কোন হতভাগ্যের করোটি। নিত্য পূজা হইত কঙ্কালমালিনীর, নিত্য হইত ছাগবলি, মহিষবলি! কিন্তু পূর্ণিমা ও অমাবস্যায় হইত নরবলি। এইভাবে বহু হতভাগা এই পথে যাইতে প্রাণ হারাইয়াছে।

একদিন সন্ধ্যার পর কালীঘাটে কালীমাতার পূজা ও অর্চনা করিয়া তিনজন লোক সেইপথে ফিরিতেছিল, তাহাদের বাস রাজাপুর গ্রামে। একটি বৃদ্ধ পুরুষ, তাহার সঙ্গে ছিল একজন স্ত্রীলোক এবং পাঁচ-ছয় বৎসরের একটি বালক, শিশু বলিলেই চলে। অন্ধকার হইয়াছে। নিবিড় বনে পথ হারাইয়া কিছু দূরে একটি আলো দেখিতে পাইয়া ঐ তিনজন যাত্রী সেদিক লক্ষ্য করিয়া লতাগুল্ম, কাঁটাবন উত্তীর্ণ হইয়া—সেদিক পানে দ্রুত চলিয়া আসিতেছিল। পথে ছিল ছোট একটি খাল—আশেপাশে ডোবা,—খালের গায়ে গভীর হোগলা-বন। সেই হোগলা-বনের আড়ালে থাকিয়া একটা বাঘ খালে জল খাইতেছিল। বৃদ্ধ আগে আগে খাল পার হইবার জন্য যেমন জলের কিনারায় আসিয়াছে, অমনি বাঘটার তীক্ষ্ণ দৃষ্টি পড়িল পথিকের দিকে। নিমেষ-মধ্যে বাঘ ঝাঁপাইয়া পড়িল বৃদ্ধের উপর, তাহার ঘাড় কামড়াইয়া লইয়া চলিয়া গেল। যাইবার সময় বাঘের একটা থাবা পড়িয়াছিল স্ত্রীলোকটির গায়ে। জল রক্তে লাল হইয়া গেল। স্ত্রীলোক ও বালকটি পড়িয়া গেল খালের পাড়ে। কাদা ও জলের ভিতর তাহাদের দেহ হইল বিলুণ্ঠিত।

দুই

সেই পথে গভীর রাত্রিতে ফিরিতেছিল মনোহর ও তাহার সঙ্গী ডাকাতেরা। একজন ডাকাত আগে আগে মশাল হাতে আসিতেছিল। অন্যদের হাতেও ছিল মশাল। সেই আলোকে তাহারা দেখিতে পাইল স্ত্রীলোকটি ও বালকটিকে। মশালধারী চিৎকার করিয়া কহিল—সর্দার, হেথা একটা মাইয়া মানুষ আর ছাইলা মইরা পইড়া আছে।

মনোহর উত্তর করিল—কে মারলে?

বোধ হয় বড় শিয়াল হবে। বাঘকে তাহারা বলিত বড় শিয়াল।

মনোহর আসিয়া দেখিয়া বলিল—নিয়ে চল, বোধ হয় বেঁচে আছে।

সর্দারের হুকুমে ডাকাতেরা স্ত্রীলোকটি ও বালকটিকে মনোহরের বাড়িতে লইয়া আসিল। ডাকাতদের সেবা-শুশ্রূষা ও যত্ন-চেষ্টায়

স্ত্রীলোকটি বাঁচিল না। মনোহর ছেলেটাকে লইয়া পড়িল মহা ফ্যাসাদে—কার ছেলে, বাড়ি কোথায়? কে সন্ধান করিবে? সন্ধান লইতে গেলেই যে বিপদ ঘটিবে। আর পালিবেই বা কে?

শেষটায় মনোহর কহিল—"পিসি, ছেলেটাকে দেখ, যত্ন কর। কার ছেলে কিছুই ত জানি না।

পিসি বলিল—কার বাছা নিয়ে শেষটায় পড়বি বিপদে, গলা টিপে মেরে ফেলে দে বাদার জঙ্গলে।

মনোহর গর্জিয়া উঠিল—তুই মাইয়া মানুষ হইয়া এমন কথা বলিস্। ডাকাত বটি কিন্তু এ হাতে কোনদিন মাইয়া মানুষ আর ছোট ছোট ছাইল্যা মাইয়া মারি নাই। পিসি তুই কি পুতনা রাক্ষসী!

অদ্ভুত বিকট হাসি হাসিল মনোহর। পিসি চুপ করিয়া রহিল।

সেদিন হইতে মনোহর ছেলেটিকে করিয়া লইল আপনার জন। তাহার কাছে গল্প করিত, তাহার জন্য ভাল কাপড়-জামা সংগ্রহ করিয়া আনিত। স্নেহের অপূর্ব পরশ লাগিল তাহার মনে ও দেহে! দিন যায়, বৎসর যায়, স্নেহ বাড়িয়াই চলে। এ কি হইল মনোহরের। ডাকাতিতে তেমন মন নাই, দলের লোকদের কথায় তেমন উল্লসিত হয় না। তাহারা মনে করিল, তবে বুঝি সর্দার আর ডাকাতি করিবে না। মাঝে মাঝে অনুরোধ উপরোধে পড়িয়া ডাকাতি করিতে যাইত।

ছেলের নাম রাখিয়াছিল সে হারাধন। হারাধন মনোহরকে ডাকিত বাবা। কোনদিন ডাকাতি করিতে যাইবার জন্য উদ্যত হইলে হারাধন তাহার গলা জড়াইয়া বলিত, বাবা, তুই কোথায় যাস্? যাস্‌নে কোথাও। কখন ফিরবি বাবা? ভয় করে একা থাকতে!

মনোহর আদর করিয়া বলিত, যাদু আমার, মাণিক আমার—এই এলাম বলে।

পিসি কিন্তু হারাধনকে একেবারেই দেখিতে পারিত না! কেন যে দেখিতে পারিত না, তাহা বোঝা খুব কঠিন নয়। পিসি ভাবিত,

মনোহরের যদি ভালমন্দ কিছু হয়, তবে সে মনোহরের টাকা-কড়ি সব দিবে তাহার গরীব দেওরকে, কিন্তু তাহা হইল না। তিনদিনের জ্বরে হইল বুড়ী পিসির মৃত্যু। সেইজন্যই হারাধন বলিত, বাবা, একা থাকতে বড় ভয় করে।

মনোহরের বয়স বাড়িতেছিল। পূর্বের মত গায়ের শক্তি-সামর্থ্য আর ছিল না। সে ভাবিত—তাই ত ভবিষ্যতে কি হইবে তাহার এই পালিত পুত্র হারাধনের? এদিকে হারাধনের পূর্বস্মৃতি কিছুই ছিল না। সে জানিত মনোহর তাহার বাবা!

সেই সময়ে ভবানীপুর অঞ্চলে খৃষ্টান পাদরীরা ধীরে ধীরে পাঠশালা খুলিতেছিলেন। গরীব-দুঃখীদের ছেলেমেয়েদের লেখাপড়া শিক্ষা দিতেন, খৃষ্টান করিতেন ও বাইবেল পড়াইতেন। একদিন হারাধনকে খৃষ্টান পাদরীর কাছে লইয়া গেল মনোহর, গিয়া বলিল—সাহেব, আমার এই ছেলেকে লেখাপড়া শেখাও।

মহা উৎসাহে পাদরী সাহেব তাহাকে ভর্তি করিয়া লইলেন। হারাধনের নাম হইল 'হারাধন বিশ্বাস। পিতার নাম মনোহর বিশ্বাস। হারাধন খুব মেধাবী ছিল। সে যত্ন করিয়া পড়াশুনা করিত। হারাধন মনোহরের কাছে আসিয়া গল্প করিত, বলিত—বাবা, সর্বদা সত্যকথা বলিতে হয়, চুরি-ডাকাতি করিতে নেই, সৎপথে চলিতে হয়।

মনোহরের মাথার চুলগুলি পাকিয়া গিয়াছিল, কাশফুলের মত সাদা হইয়া গিয়াছিল তাহার মাথা। সে চলিতে ফিরিতেও পারিত না। এদিকে কোম্পানীর আমল শুরু হইয়াছিল। চুরি, ডাকাতি, রাহাজানি কমিয়া আসিতেছিল। ফাঁড়ি থানার সৃষ্টি হইতেছিল—চারিদিকে কড়া নজর। মনোহর-ডাকাতের দলও ছিন্নভিন্ন হইয়া গিয়াছিল। এখন সে ছেলেকে ছাড়িয়া থাকিত না একমুহূর্তও। এইভাবে দিন যাইতেছিল।

তিন

মনোহরের শেষের দিন ক্রমে ঘনাইয়া আসিল। তাহার মনে জাগিতেছিল অনুতাপ। কিন্তু বুদ্ধিমান ও বিচক্ষণ মনোহর, তাহার

পূর্বজীবনের কথা গোপন করিল। বলিলে পাছে তাহার প্রতি ঘৃণা হয় হারাধনের, সেজন্য সে কোন কথাই বলে নাই। শেষ জীবনে সে চাষবাস করিয়া, লোকজন খাটাইয়া চাষীরূপে জীবন কাটাইত। হারাধন তাহাকে সাহায্য করিত প্রফুল্ল মনে।

জ্বরে পড়িল মনোহর। উত্থানশক্তি রহিত হইল তাহার। একদিন সে বিছানার পাশে হারাধনকে ডাকিয়া ঘরের মেঝের একটি জায়গা দেখাইয়া বলিল—বাবা, ওখানটা খোঁড় ত!

—কেন বাবা?

—দেখ না খুঁড়ে!

হারাধন খুঁড়িতে খুঁড়িতে পাইল, তিন ঘড়া টাকা ও মোহর এবং তাহার মধ্যে অনেক সোনা-রূপা। মনোহর কম্পিত হস্তে হারাধনের হাত ধরিয়া কহিল—বাবা হারাধন, এই সব তোর। আমি আর বেশীদিন বাঁচিব না। আমি মরে গেলে ঘটা করে শ্রাদ্ধ-শান্তি করবি, কাঙ্গাল-দুঃখীদের যত্ন করে খাওয়াবি। কয়েকটা দীঘি, পুকুর কাটিয়ে দিবি, এদিকে গ্রীষ্মকালে জলের বড় কষ্ট। গরু-মোষ জল পায় না, মানুষ জল খেতে পায় না। এই কাজ অবশ্য করবি, ভাল বাড়িঘর করে সুখে বাস করবি। বড় ইচ্ছা ছিল তোকে একটি সুন্দরী মেয়ে এনে বিয়ে দিই; পারলেম না ত! সে সুখ আমার নেই!……

মনোহর ডাকাত মরিল, কিন্তু তাহার নাম হইয়া রহিয়াছে অমর। হারাধন মনোহরের প্রত্যেকটি কথা অক্ষরে অক্ষরে পালন করিয়াছিল। আজও দক্ষিণ কলিকাতার এই অঞ্চল ঘুরিয়া ফিরিয়া দেখিলে দেখিতে পাওয়া যায়, তাহার স্মৃতিরক্ষার জন্য হারাধন যে সকল দীঘি ও পুকুর খনন করিয়াছিল, সেই সকলের অস্তিত্ব পাড়ার চারিদিক ঘিরিয়া অসংস্কৃত অবস্থায় এখনও আছে। সেইসব দীঘি-পুকুরের আয়তন বড় কম ছিল না। তোমরা দেখিলেই তাহা বুঝিতে পারিবে।

আজ মনোহর নাই, হারাধনও নাই—কিন্তু মনোহরের স্মৃতিকে অমর করিয়া রাখিয়াছে দক্ষিণ কলিকাতার মনোহরপুকুর রোড।



রায়-বাহাদুর ভালুক

নামটি কেমন ?—না, রায়-বাহাদুর ভালুক ! তোমাদের আশ্চর্য মনে হইতেছে। কিন্তু যে গল্প বলিতেছি, তাহা যেমন সত্য, রায়-বাহাদুর ভালুক এই উপাধিটির মধ্যেও আছে তেমনি সত্য।

সে অনেক দিন আগের কথা—একশো বছরেরও বেশী আগের। একদিন একজন ব্রাহ্মণ অনেক নগদ টাকা ও ব্যাঙ্ক-নোট লইয়া একটি ভালুক কিনিবার জন্য হুগলী শহরে গিয়াছিলেন, কিন্তু কোন কারণে ভালুক কেনা না হওয়ায় একখানি তিনদেঁড়ে পানসী নৌকা ভাড়া করিয়া বাড়ী ফিরিতেছিলেন। গড়িহাটি নামক একটি হাটের কাছে আসিতে আসিতে সন্ধ্যা হইয়া গেল। সেখান হইতে যখন পলতার ঘাটে আসিলেন, তখন সেখানে নৌকা ভিড়াইয়া মাঝিরা ব্রাহ্মণকে কহিল—'আপনার বাড়ি পৌঁছতে রাত্রি শেষ হয়ে যাবে। জোয়ার এসেছে, নৌকা চালান হবে কঠিন। রাত্রিশেষে নৌকা ছেড়ে দিলে ভাটির টানে সকাল সকাল পৌঁছা যাবে।'

ব্রাহ্মণ বলিলেন—'তোমরা যা ভাল বুঝবে, তাই করবে। তবে কি জান, রাতারাতি বাড়ী ফিরলেই ভাল হ'ত।'

মাঝিরা বলিল—'সে ত ঠিক কথা। তবে বুঝতেই পারছেন, জোয়ার ঠেলে নৌকা নিয়ে বড় একটা এগুতে পারব না। তাই নৌকা এই ঘাটেই বাঁধা যাক।'—তা বাপু, যেমন ইচ্ছা তাই করো।

নৌকা ঘাটে বাঁধা হইল। কিছুক্ষণ পরে একজন মাঝি বলিল—ঠাকুরমশাই, একটা কথা।

—কি কথা বাপু !

—'আজ্ঞে, কাছাকাছি আমাদের বাড়ি। আপনি যদি অনুমতি করেন, তবে একে একে আমরা বাড়ি থেকে খেয়ে আসতে পারি।'

ব্রাহ্মণ বলিলেন—'বেশ, তবে তাড়াতাড়ি এস। এই নদীর ঘাটে একা থাকা ত ভাল নয়।'—সে ত ঠিক কথা, ঠাকুরমশাই !

একজন মাঝি চলিয়া গেল। এক ঘণ্টা দুই ঘণ্টা কাটিয়া গেল তবু সেই মাঝি ফিরিল না।

এইবার দ্বিতীয় মাঝি কহিল—'তাই ত ঠাকুরমশাই, ও ত বড় দেরী করে ফেলল, দেখে আসি কেন দেরী হচ্ছে! আমি গিয়েই তাকে পাঠিয়ে দেব, আর আমিও ফিরে আসব।' এই বলিয়া দ্বিতীয় মাঝিও চলিয়া গেল। এদিকে অনেকটা সময় কাটিয়া গেল, তাহারা দুই জনে ফিরিয়া আসিল না। তখন তৃতীয় মাঝি ঐ দুইজনকে অনেক গালাগালি দিয়া বলিল—'যাই আমি ওদের পাঠিয়ে দিই!'

একপা দুইপা করিয়া সেওচলিয়া গেল। বাকি যে হালের মাঝি ছিল, সেও ঠিক ঐরূপ কথা বলিয়া নৌকা ছাড়িয়া চলিয়া গেল।

ব্রাহ্মণ রহিলেন একা। তিনি মনে মনে ভাবিলেন--'এ কি সর্বনাশ! যেখানে বাঘের ভয় সেখানেই রাত হয়! এইরূপ ভাবনায় তাঁহার মনে নানা শংকার উদয় হইল।' তখন নৌকা হইতে উঠিয়া—সঙ্গে টাকার পুঁটুলিটি লইয়া নদীর পারে আসিলেন। দেখিলেন একটা বড় বট গাছের কাছে এক মুদীর দোকান। মুদীকে দেখিয়া তাঁহার ভরসা হইল। ব্রাহ্মণ মুদীকে মাঝিদের সব কথা বলিলেন এবং জিজ্ঞাসা করিলেন— মুদী ভাই, বল ত দাঁড়ি-মাঝিরাএখনো কেন এল না? কারণ কি?

মুদী বলিল—ঠাকুরমশাই, কি দেখছেন? আপনার ভয়ানক বিপদ উপস্থিত। আপনার নৌকার দাঁড়ি-মাঝিরাই ডাকাত। আপনাকে মেরে ফেলে টাকাকড়ি সব কেড়ে নেবে, এজন্য আরও সব সঙ্গী দস্যুদের ডাকতে গেছে।

ব্রাহ্মণ নিরাশ হইয়া কহিলেন—'তবে ভাই, এখন উপায় কি—কি করা যায়? তুমি যদি অনুগ্রহ করে আমাকে কোনও নিরাপদ স্থানে রেখে এস, তবে আমি রক্ষা পাই।'

মুদি কহিল—'সে কি করে হবে? আমি একা, দোকান ফেলে কি করে যাই? কিন্তু আপনাকে লুকিয়ে রাখতে পারি।

ব্রাহ্মণ ভাবিলেন, কে জানে এই মুদী কেমন! এও ত ডাকাত-দলের একজন হতে পারে। একেই বা বিশ্বাস কি? একে জানি না,

চিনি না, যদি আশ্রয় দিয়ে আমার প্রাণনাশ করে? এখন কি করি!

নিরুপায় ব্রাহ্মণ কি করিবেন, ভাবিতে ভাবিতে পথ দিয়া চলিলেন। পথের দুইধারে বড় বড় সব গাছপালা অন্ধকার রাত্রিকে নিবিড় অন্ধকার করিয়াছে। এমন সময় দেখিলেন, নিকটেই একটি বেশ বড় বাগান। বাগানের দরজার কাছে একজন লোক একটা ভালুক লইয়া বসিয়া আছে। লোকটা বেশ জোয়ান। মাথায় একরাশ ঝাঁকড়া চুল। ব্রাহ্মণ তাহাকে দেখিয়া কহিলেন—'ভাই, আমি বড় বিপদে পড়েছি। তুমি যদি আমাকে সঙ্গে করে থানা পর্যন্ত চল, তবে আমি ধনে-প্রাণে রক্ষা পাই।'

ভালুকওয়ালা বলিল—'ঠাকুরমশাই আমি সব কথাই শুনলাম ও বুঝলাম, তবে কি জানেন, আজ সমস্ত দিন ভিক্ষা না হওয়াতে আমি না খেয়ে আছি, আমার ভালুকটাকেও কিছু খাওয়াতে পারি নি। আপনি যদি আমাকে কিছু পয়সা দেন, তবে আমি ভালুকটাকে খাওয়াতে পারি, আমিও খেতে পারি; তারপর আপনি যে-কথা বলবেন, আমি তাই শুনব।'

ব্রাহ্মণ তাহাকে কিছু পয়সা দিলেন—সে মুদীর দোকান হইতে খাদ্যদ্রব্য আনিয়া নিজেও খাইল এবং ভালুকটাকেও খাওয়াইল। তারপর কহিল—'ঠাকুর, সঙ্গে আসুন, আমি গঙ্গা হইতে ভালুকটাকে জল খাইয়ে নি।' ব্রাহ্মণ ভাবিলেন, না জানি ইহার পেটের ভিতর আবার কি দুষ্টবুদ্ধি আছে।

ভালুকওয়ালার সঙ্গে সঙ্গে ব্রাহ্মণ ভয়ে ভয়ে চলিলেন। সে তাহার ভালুককে জল খাওয়াইল, তারপর বলিল—'ঠাকুরমশাই আপনি এই নৌকার উপর উঠুন। কোন ভয় নেই, আমি আপনাকে রক্ষা করব, তাতে সন্দেহ নেই। আমি বেঁচে থাকতে আপনার কোন ভয় নেই। আপনি নৌকার খোলের ভিতর লুকিয়ে থাকুন; দেখুন না, আমি কেমন ডাকাতদের জব্দ করি!' ব্রাহ্মণ তখন আর কি করেন? আর উপায় নাই, সুতরাং নৌকার খোলের মধ্যে প্রবেশ করিলেন। ভালুকওয়ালা নৌকার উপর বসিল এবং কি করিল জান? সে তাহার ভালুকের মুখের বাঁধন খুলিয়া দিয়া তাহাকে বেশ

ভাল ভাবে নানারকম কায়দা শিখাইতে লাগিল। ভালুক গোঁৎ-গোঁৎ শব্দ করিতে লাগিল।

রাত্রি দ্বিপ্রহর হইয়াছে। এমন সময় নৌকার মাঝিরা তাহাদের সঙ্গে একদল লোক লইয়া আসিয়া গঙ্গার পারে উপস্থিত হইল। প্রত্যেকের হাতে লাঠি-বর্শা ও তলোয়ার; মুখ কালিমাখা--যেন প্রেত পিশাচ আর কি—এমনি ভীষণাকৃতি! তাহারা চীৎকার করিয়া ডাকিতে লাগিল—ঠাকুরমশাই! ও ঠাকুরমশাই!

ব্রাহ্মণের কোন উত্তর না পাইয়া তাহারা ভালুকওয়ালাকে নৌকার উপর বসা দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল—তুই কে রে?

—দেখতে পাচ্ছ, আমি ভালুকওয়ালা।

--তুই আমাদের নৌকায় কেন? ঠাকুরমশাই কোথায় গেল?

ভালুকওয়ালা বলিল—'আমি এই নৌকায় কাকেও দেখি নি; রাত্রি হয়েছে, কোথায় যাব? শীতও খুব জোরে পড়েছে, তাই এই খালি নৌকায় বসে আছি।'

একজন দস্যু-মাঝি বলিল—তুই বেটা নেমে যা। ভালুকওয়ালাও কর্কশকণ্ঠে কহিল—'আমি কখনই নৌকা থেকে নামব না।'

তবে রে বেটা। বলিয়া ডাকাতেরা তাহাকে আক্রমণ করিতে আসিল, অমনি ভালুকওয়ালা ভালুককে কহিল—যা বেটা জাম্বুবান! হিস্ হিস্ হিস্—। অমনি সেই শিক্ষিত পশু লাফ দিয়া ডাকাতদের উপর পড়িল এবং নখ দ্বারা আঁচড়াইয়া ও কামড়াইয়া এমনভাবে ভীষণ শব্দ করিতে করিতে তাহাদের জখম করিতে লাগিল যে, তাহাদের আর নড়িবার শক্তি রহিল না।

বাকী যাহারা ছিল তাহারাও পলাইতে পারিল না, যেমন পলাইতে যায় অমনি ভালুক পিছু ছুটিয়া তাহাদের আক্রমণ করে। দস্যুরা ভালুক মারল রে—খেয়ে ফেলল রে—বলিয়া চীৎকার করিতে লাগিল। ওই সময় এক চৌকিদার রোঁদে বাহির হইয়াছিল, সে সেখানে আসিয়া লোকদের জিজ্ঞাসা করিল—কি হয়েছে?

ভালুকওয়ালা কহিল—'তুমি থানায় খবর কর, পরে সব কথা

জানতে পারবে।’ চৌকিদার তখনই সংবাদ দেওয়ায় বৈদ্যবাটির দারোগা ত্রিশ-বত্রিশ জন লোকসহ তদন্ত করিতে আসিলেন এবং ভালুকওয়ালাকে বলিলেন—কি হয়েছে বল।

—হুজুর, আপনি চারদিক পুলিশ ও পাহারাওয়ালা দিয়ে ঘিরে ফেলুন, যেন একজন লোকও না পালাতে পারে, তারপর সব বলছি। এই কথা বলিয়া সে রণজয়ী ভালুকটিকে ধরিয়া আনিয়া তাহার রাগ কমাইল এবং বাঁধিয়া রাখিয়া দারোগাকে নৌকায় আসিতে বলিল।

দারোগা নৌকায় আসিলে ব্রাহ্মণ নৌকার খোলের ভিতর হইতে বাহির হইয়া আসিয়া সমুদয় ঘটনার কথা বলিলেন এবং সঙ্গের টাকা দেখাইলেন। দারোগা সব শুনিয়া ব্রাহ্মণকে ভালুকসহ ভালুকওয়ালাকে এবং ডাকাতদের থানায় আনিলেন এবং পরদিন সকালবেলা তাহাদের সকলকে শ্রীরামপুরের ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট উপস্থিত করিলেন। চৌকিদার সব বিষয়ের তদন্ত করিয়া জানাইল যে, ঐ বারোজন ডাকাত দাগী আসামী এবং মেয়াদ খালাসী।

ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব আহত ডাকাতদের ডাক্তারখানায় পাঠাইলেন। ডাক্তার সাহেব ডাকাতদের আঘাত পরীক্ষা করিয়া কহিলেন—এদের মধ্যে অনেকেই বাঁচবে না।

ব্রাহ্মণ ধনে ও প্রাণে এইরূপ অদ্ভুত উপায়ে রক্ষা পাইয়া এতদূর সন্তুষ্ট হইলেন যে, তিনি ম্যাজিস্ট্রেটের সামনে ভালুকওয়ালাকে একশত টাকা পুরস্কার দিলেন। ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবও ভালুকওয়ালার প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া নিজে দুই শত টাকা প্রদান করিলেন।

সেকালের একখানি পত্রিকাতে এই সংবাদ প্রকাশ করিয়া লেখা হইয়াছিল—“ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব স্থপারিণ্টেন্‌ডেণ্ট পুলিশাধ্যক্ষ মিঃ ডেম্পিয়ার সাহেবের সহযোগে ঐ ভালুককে ‘রায় বাহাদুর’ উপাধি দিয়া ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটি পদে অভিষিক্তকরণ-কারণ অনুরোধ সহকারে অবিলম্বেই গবর্মেণ্টকে রিপোর্ট করেন। ভালুকরাজ যেরূপ বীরত্ব প্রকাশপূর্বক দস্যু ধৃত করিয়াছে, তাহাতে সে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট পদ দূরে থাকুক, অনেক পদস্থ ম্যাজিস্ট্রেটদিগের অপেক্ষা তৎপদের

বিশেষ যোগ্য হইয়াছে। ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবরা লাঠির নিকটস্থ হয়েন না, ভালুক সাহেব পুনঃ পুনঃ লাঠির আঘাতে আহত হইয়াও যুদ্ধে পরাস্ত হইল না।

ভালুকের এই ডাকাত দমনের সংবাদ পড়িয়া সেকালের একজন সংবাদদাতা লিখিয়াছিলেন—সম্পাদক মহাশয়, আপনার ৩রা বৈশাখ শুক্রবাসরীয় পত্রে ঋক্ষ কর্ত্তৃক দস্যু ধৃত হওয়ার বিষয়ে যে সংবাদ প্রকাশ হইয়াছে তাহা যথার্থ। আমি শ্রীরামপুর হইতে বিশিষ্টরূপে জ্ঞাত হইয়াছি এবং যে ব্যক্তি বিপদগ্রস্ত হইয়া ভল্লুক কর্ত্তৃক রক্ষা পান, তাঁহার সহিত আমার সাক্ষাৎ হইয়াছিল। তিনি বিস্তারিত বিবরণ স্বমুখে ব্যক্ত করিয়াছেন। ঐ ভালুক কেবল নখাঘাত দ্বারা দুর্জ্জনদিগ্যে ধৃত করে নাই, তাহার মুখের থুতু দুরাত্মাদিগের অঙ্গের যে যে স্থানে লাগিয়াছিল, সেই সেই স্থান ক্ষত হইয়াছে। হে মহাশয়! আপনি ঐ জাম্বুবানকে রায়-বাহাদুর উপাধি দিয়া ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটি পদে অভিষিক্ত করণের যে প্রস্তাব করিয়াছেন, আমি তাহাতে অতিশয় তুষ্ট হইয়াছি, কিন্তু আমার বিবেচনায় তাহাকে এককালে ফুল ম্যাজিস্ট্রেটি দেওয়াই উচিত হয়, কারণ ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটেরা বরং পদে থাকিয়া পদে আছেন, শ্বেতপুরুষ ম্যাজিস্ট্রেটরা কিছুই করিতে পারেন না। আপাততঃ কৃষ্ণনগর জেলায় অনেক দস্যুতা হইতেছে, অতএব তাহাকে প্রথমে সেইখানেই পাঠানো উচিত।

এখন বলত, আমরা আমাদের গল্পের নাম যে রায়-বাহাদুর ভালুক দিয়াছি, তাহা ঠিক হইয়াছে কিনা?

সংবাদ প্রভাকর—৩রা বৈশাখ, শকাব্দাঃ ১৭৭০ (১২৫৫), ৯ই বৈশাখ দ্রষ্টব্য



ডাকাত গঙ্গারাম

এক

শতবর্ষ পূর্বে চাকদহ ছিল ভীষণ নরবলি, রাহাজানি আর জলে-স্থলে চুরি ডাকাতির জন্য বিখ্যাত। সেকালে চাকদহ ছিল অতি ভয়ানক স্থান।

সুখসাগরের উত্তরে চাকদহ। ঐতিহাসিকেরা চাকদহ সম্বন্ধে বলিয়াছেন—Notorious for ghat murders। গঙ্গার ঘাট ছিল বনজঙ্গলে ঢাকা। সেই ভীষণ অরণ্যে যেমন বাস করিত হিংস্র ব্যাঘ্র-ভল্লুক, তেমনি ভয়ংকর বিষাক্ত সর্প। গঙ্গার ঘাট ছিল অতি ভয়াবহ। একদিকে অরণ্য মধ্যে ভীষণা শ্মশানকালী, অন্যদিকে মহাশ্মশান। সে-সময়ে চাকদহ ছিল শবদাহ ও গঙ্গাস্নানের জন্য বিখ্যাত। সেখানকার শ্মশান—মহাশ্মশান নামে পরিচিত ছিল। দূর-দূরান্ত হইতে শবদেহ এই পুণ্যস্থানে ভস্মীভূত করিবার জন্য আনা হইত। এ-স্থানকে পুণ্যস্থান কেন বলা হইত জান? ভগীরথ যখন গঙ্গা আনয়ন করেন, তখন তাঁহার রথের চক্র এই স্থানের মৃত্তিকা মধ্যে প্রোথিত হইয়াছিল বলিয়া এস্থানের নাম চক্রদহ এবং ক্রমে সহজ ভাষায় হইয়াছে চাকদহ।

কুড়ি-একুশ দিনের দূর দেশ হইতেও শবদাহ করিবার জন্য চাকদহের মহাশ্মশানে আনা হইত। সেই সব গলিত শবের দুর্গন্ধের জন্য পথে লোক চলাচল দুঃসাধ্য হইত। তোমরা হয়ত জান না যে, পূর্বে কলিকাতায় ও তাহার নিকটস্থ পল্লীতে কাহারও মৃত্যু হইলে

গঙ্গার পশ্চিম তীরে দাহ করা হইত। যে শ্মশানকালীর ক বলিতেছি, সেখানে ডাকাতেরা প্রতি সপ্তাহে বা মাসে দেবীর কা দিত নরবলি। ঘাটে কোন নৌকা ভিড়িলে ডাকাতেরা নৌক যাত্রীদের লুঠতরাজ করিয়া জিনিসপত্র যেমন কাড়িয়া লইত, তেমা তাহাদের কাহাকেও ধরিয়া লইয়া ভীষণা শ্মশানকালীর নিকট বা দিত এবং সেই রক্তরাঙা তলোয়ার হাতে লইয়া ছুটিত ডাকা করিতে। নররক্তে ললাটে পরিত জয়-তিলক। এই ডাকাতদে ভয়ে গঙ্গার পশ্চিম তীরে শবদাহ করা হইত।

এই অঞ্চলের বিখ্যাত ডাকাত ছিল গঙ্গারাম। তাহার দলে ছি প্রায় পঞ্চাশ জন লোক। হিন্দু, মুসলমান, দেশী খৃষ্টান, সাঁওতাল- সব জাতির ও নানা দেশের লোক ছিল তাহার দলে। গঙ্গারা নিজে যেমন দক্ষ লাঠিয়াল ছিল—তলোয়ার খেলিতে নিপুণ ছিল তেমনি ছিল বিখ্যাত কুস্তিগীর। জাতিতে ছিল সে বাগ্দী। দলে লোকদের উপর তাহার অসাধারণ প্রতিপত্তি ছিল। দলের লোকেরা ছিল বেশ মজবুত গঠনের এবং সড়কি-বল্লম খেলিতে পটু।

একদিন চাকদহের কাছে এক বাড়িতে বিবাহ-উৎসব। যাঁহ বাড়িতে বিবাহ তিনি ছিলেন প্রকাণ্ড ধনী ব্যবসায়ী, নাম ছিল তাঁহা মথুর শা। মহাজনী কারবার, জাহাজের বিলাতী মাল খালাস কারবার, দেশ-বিদেশে নানা খাদ্যশস্যের আমদানি-রপ্তানি, নীলক কুঠিয়াল সাহেবের সময়ে অসময়ে টাকা ধার দেওয়া, জমিজম অলংকার-পত্র বন্ধক রাখিয়া সুদী কারবার--সব কাজই চলিত তাঁহা আড়তে। কৃষ্ণনগর, মুর্শিদাবাদ, কলিকাতায় ছিল তাঁহার আড়ত ও গদী। এমন কি সুদূর ঢাকা ও আসামের নানা স্থানেও তাঁহার গদী ছিল। কলিকাতার চিৎপুর অঞ্চলে গঙ্গার ঘাটের কাছে ছিল তাঁহার মস্ত আড়ত! মস্ত বড় ধনী—কোটি কোটি টাকার মালিক। পুকুর দীঘি, নানা ফুল-ফলের বাগানে শোভিত বিরাট বাড়ির চারিদিকে প্রাচীরে ঘেরা। ফটকে হাতে তলোয়ার পশ্চিম দেশীয় পাহারা- ওয়ালা। পাঁড়েজী আর দোবেজীর মস্ত বড় গোঁপ, গালপাট্টা দাড়ি— যেন যমের দোসর আর কি!

মথুর শার একমাত্র মেয়ে রাধারাণীর বিবাহ। বরের বাড়ি কলিকাতা শহরে। ধনে মানে তাহারাও শ্রেষ্ঠ! নদীপথে বজরা করিয়া বিলাতী বাজনা বাজাইয়া সেকালের বড়লোকেরা গমনাগমন করিতেন। মথুর শাও সেই ব্যবস্থাই করিয়াছেন। লোকজন, জ্ঞাতি-কুটুম্বে বাড়ি-ঘর ভরিয়া গিয়াছে। কাজের বাড়িতে যেমন হয়, আনন্দের অবধি নাই—সকলেই প্রসন্ন মুখ। ফটকে নহবত বাজিতেছে। মহা ধূমধাম চলিতেছে।

দুই

গঙ্গার ঘাটে লোকারণ্য। কলিকাতা হইতে বরযাত্রীরা আসিয়াছেন। বর আসিয়াছে। বরকর্তা আসিয়াছেন। নৌকা ভিড়িবামাত্র মথুর শা নিজে এবং তাঁহার ছেলেরা আসিলেন, গ্রামের ভদ্রলোকেরা আসিলেন বর ও বরযাত্রীকে অভ্যর্থনা করিতে। শঙ্খ বাজিল। ইংরাজী বাজনা বাজিল বরসহ শোভাযাত্রা চলিল মথুর শার বাড়ির দিকে। লণ্ঠনের আলো, মশালের আলো জ্বলিল; চারিদিক দীপ্তিমান হইল। বরযাত্রী দল একটা বাগানের পাশ দিয়া বাঁ দিকের যেমন শা-জীর বাড়ির দিকে চলিয়াছে—অমনি সেইখানে আসিয়া মিলিত হইল প্রায় একশত লোকের শোভাযাত্রা সহ আর একদল বরযাত্রী। তাহাদের শোভাযাত্রার সঙ্গে ঢাক, ঢোল, সানাই, বাঁশী, নাগরা-টিকারা বাজিতেছিল। মথুর শার বরযাত্রীদের পেছনে তাহারা চলিয়াছে। তাহাদিগের দিকে কেহ বড় একটা লক্ষ্য করে নাই, সকলেই মনে করিতেছিল—বোধ হয় একদল দেশী বাজনদারও মথুর শা বায়না করিয়াছেন।

ক্রমে উভয় দল অদৃশ্য হইল। সকলেই বাড়ির আলোকমালা-বিভূষিত বৃহৎ ফটকের মধ্য দিয়া প্রবেশ করিল। বর ও বরযাত্রীদের দেখিবার জন্য গ্রামবাসী নরনারীরা বাহির হইয়াছিল। লোকজনের হৈ-চৈ, আদর-অভ্যর্থনা, আসুন, বসুন রবে চারিদিকে গোলমাল লাগিয়াছে। এই তামাক আন, পান দাও, ওরে সরবত নিয়ে আয় —এই সব শব্দ শুনা যাইতেছে। মেয়েরা বাড়ির মধ্য হইতে উলুধ্বনি

করিতেছে। শঙ্খ বাজিতেছে। গড়ের ইংরাজী বাজনা বাজিয়া উঠিয়াছে। এমন সময় ভীষণ হা-রে রে-রে রবে বিকট চীৎকারে চারিদিক ধ্বনিত হইয়া উঠিল। ওরে ডাকাত পড়েছে, পালা পালা রবে চারিদিকে একটা বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হইল।

বিবাহ বাড়ির মহা-সমারোহের মধ্যে হইল একটা মহা-আতঙ্কের সৃষ্টি। ঘন ঘন শোনা যাইতে লাগিল—হা-রে-রে-রে রব!

তিন

কে যেন কি কৌশলে বাড়ির সব আলো নিবাইয়া দিয়াছে। ঝন্‌ঝন্‌ শব্দে ঝাড়-লণ্ঠন সব ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে। অন্ধকার—চারিদিকে ভয়ানক অন্ধকার। কে শত্রু কে মিত্র কিছুই বুঝা যাইতেছে না। মারামারি, ছুটাছুটি, কান্নাকাটি—ভীষণ বিপদে সকলেই কি যে করিবে স্থির করিতে পারিতেছিল না। বরকর্তা বরযাত্রীরা কলিকাতার মানুষ, তাঁহারা এইরূপ আকস্মিক আক্রমণে একেবারে হতভম্ব হইয়া পড়িয়াছিলেন। মধুসূদন সংকটে রক্ষা করো, রক্ষা করো বলিয়া মথুর শা কাঁদিতেছিলেন।

ডাকাতেরা অন্দরমহলে প্রবেশ করিল এবং কৌশলে অতি দ্রুত কন্যার গায়ের অলংকার কাড়িয়া লইল। ডাকাতের সর্দার বলিল—তোমার কোন ভয় নেই, তোমার কোন ক্ষতি হবে না। তারপর পুরমহিলাদের বলিল—তোমরা মায়েরা নিজের হাতে সব গয়না খুলে দাও; আমি কাপড় পেতেছি, এই কাপড়ের ওপর দাও। আমরা মেয়েদের গায়ে হাত তুলি না। মা সকল, তাড়াতাড়ি খুলে দাও। গোয়েন্দা পুলিশ আসবার আগে আমাদের সব দিয়ে ফেল। যদি না দাও, তবে বাধ্য হয়েই ছিনিয়ে নেব। হল্লা করো না, চীৎকার করো না।

মহিলারা সকলেই ঝুপ্‌ঝাপ করিয়া গায়ের অলংকার খুলিয়া দিল। যে-ঘরে বরের জন্য দান-সামগ্রী, বরের পণ বড় একটা সোনার থালে করিয়া সাজানো ছিল, সেখান হইতে মুঠা মুঠা করিয়া প্রায় দশ-পনেরো হাজার টাকা ডাকাতেরা যে যে-ভাবে পারিল লুটিয়া

লইল। এভাবে বোধ হয় পনেরো-কুড়ি মিনিটের মধ্যে সব কাজ সারিয়া ডাকাতেরা নির্বিঘ্নে চলিয়া গেল। যাহারা বাধা দিতে আসিয়াছিল, তাহারা লাঠি, বল্লম, সড়কির আঘাতে আহত ও নিহত হইল। যাইবার সময় ফটকের কাছে দাঁড়াইয়া ডাকাতের সর্দার চীৎকার করিয়া বলিল—শা-জী, আমাদের কাজ হয়ে গেছে। এখন কন্যার বিবাহ দিন, নিমন্ত্রিতদের আপ্যায়িত করুন। আপনার ত অনেক আছে, আমরা আর কতই বা নিলাম!

মথুর শা করযোড়ে বলিলেন—"বাবা, আমার মান রক্ষা করো। আর যেন কোন বিপদ না ঘটে। যা চাও তাই আমি দেব, কে তুমি বাবা!"

—আমি ডাকাত গঙ্গারাম! নাম শোনেন নি? ওরে বাবা! বলিয়া মথুর শা মূর্চ্ছা গেলেন। নিশীথ রাত্রিতে নিরাপদে বিবাহ হইয়া গেল। পরদিন বর-কনে ও বরযাত্রিদল নিরাপদে কলিকাতা চলিয়া গেলেন। মথুর শার বাড়িতে আর কোন উপদ্রব হয় নাই।

১৮১৫ খ্রীষ্টাব্দে মথুর শার বাড়িতে এই ভীষণ ডাকাতি হইয়াছিল। গঙ্গারাম ছিল সে অঞ্চলের বিখ্যাত ডাকাত। তাহার ডাকাতিতে ছিল অদ্ভুত কৌশল। সে তাহার দলের ডাকাতদের বরযাত্রী সাজাইয়া ঢাক, ঢোল, সানাই, বাঁশী, নাগরা, টিকারা বাজাইয়া গ্রামে প্রবেশ করিত। তাহাদের শত শত মশালের আলোকে গ্রামখানি প্রদীপ্ত হইয়া উঠিত। বর ও বরযাত্রিদল দেখিবার জন্য যেমন গ্রামবাসী নরনারীরা বাহির হইত, তখন ইহারা 'হা-রে-রে-রে' রবে বিকট চীৎকার করিতে করিতে লাঠি, বল্লম, সড়কি, তলোয়ার প্রভৃতি লইয়া নির্ভীকভাবে গ্রামকে গ্রাম লুণ্ঠন করিত—নিরীহ গ্রামবাসীদের নানারূপে নির্যাতন ও হত্যা করিয়া অবশেষে গ্রাম জ্বালাইয়া দিয়া চলিয়া যাইত।

গঙ্গারাম পরে ধরা পড়ে। ধৃত হইলে সে স্বীকারোক্তি করে যে, মাত্র বারো বৎসর বয়সে ডাকাতের দলে মিশিয়া সে ডাকাতি আরম্ভ করে। সে নদীয়া, যশোহর, বর্ধমান প্রভৃতি অঞ্চলে নিজের দল লইয়া ছত্রিশ বার ডাকাতি করিয়াছে।



হনুমান চোরে

এক

চূর্ণী নদীর পারে এক প্রকাণ্ড ধনীর বাড়ি। নদী যেখান দিয়া আঁকিয়া-বাঁকিয়া গিয়াছে, সেখানেই বাড়িখানি থাকায়, দূর হইতে নৌকারোহীরা বাড়িখানি দেখে, খোলা মাঠের ভিতর দিয়া পায়ে-চলা পথিকেরা পথ নির্দেশ করিয়া চলে।

গ্রামের মালিক হরিমোহন বসু। সাধু সজ্জন ব্যক্তি। বারো মাসে তেরো পার্বণ করেন। বার্ষিকী রাসপূর্ণিমায় তাঁর প্রতিষ্ঠিত গিরিধারী ও রাধারাণীর উৎসব হয়, মেলা বসে। সামনের মাঠে দীঘির পাড়ে মেলা হয়। সে-মেলায় নানা দেশ হইতে লোক আসে, জিনিসপত্র কেনাবেচা হয়। শহর হইতে পসারীরা আসে। মেলার খুব নামডাক।

মেলা শেষ হইয়াছে। দোকানীরা সব জিনিসপত্র বাঁধিয়া ছাঁদিয়া যার যার ঘরে চলিয়া যাইতেছে। মাঠ খালি হইয়া আসিয়াছে। কার্তিক মাসের শেষ। শীতের আভাস মাত্র দেখা দিয়াছে। তেমন কিছু নয়। দূরে—নদীর পাশে পাশে কোথাও অরণ্য—কোথাও নদীর বুকে পারের কাছাকাছি রাস্তা পড়িয়াছে। সন্ধ্যার পর একখানি, দুইখানি, তিনখানি নৌকা আসিয়া চরের একপাশে ঝাউবনের আড়ালে ভিড়িল।

একখানি ছিপ-নৌকার মধ্য হইতে বাহির হইল একজন খঞ্জ। মাথায় তাঁহার ঝাঁকড়া চুল। হাতে একখানি লাঠি, লাঠির উপর ভর করিয়া সে হরিমোহন বাবুর সদর দরজার ভিতর ঢুকিল। আকাশে নক্ষত্র। ক্ষীণ আলো। বেশ অন্ধকার। হনুমান চৌবে রুটি সেঁকিতেছে, সঙ্গে সঙ্গে গাহিতেছে—সীতাপতি রামচন্দ্র রঘুপতি রঘুরাই।

এমন সময় খোঁড়া লোকটি চৌবেকে বলিল—গোড় লাগে পাণ্ডিতজী!

জয় সীতারাম! বাহিরে চুল্লীর অগ্নিতে সেই বীভৎস মুর্তি দেখিয়া চৌবে সহসা চমকিয়া উঠিল, পরে কহিল—তুই কোন্ হ্যায় রে? চৌবেজী বাংলা দেশে থাকিয়া বেশ একটু বাংলা শিখিয়াছিল, তাহার ভাইবোনদের কাছে বলিত, হামি বাঙালীদের মত বাংলা বলতে পারি। তাই চৌবেজী কহিল—হাঁ রে তুই কোন্ রে? ভূতকা মাফিক আসিয়াছিস? কি মতলব?

খোঁড়া চৌবেজীর ঘরখানির রকে বসিল, কহিল—চৌবেজী, মেলা দেখতে আয়া হ্যায়, ভারি জব্বর মেলা। সঙ্গীসাথীরা সব চলে গেছে। খাঁ-খাঁ করে মাঠ, থাকবার কোন জায়গা নেই। যদি কর্তাকে বলে আমাকে এক রাত্রির জন্য থাকবার ঠাঁই করে দেন, তবে রামজী আপকো বহুত দোয়া করবেন।

চৌবেজী কহিল—সে ত ঠিক হ্যায়! মানুষকা নসিবমে রামজী কখন যে কাকে দুখ দেন, কখন সুখ দেন, কে বলতে পারে? আপ বৈঠো। পরে একটু ভাবিয়া কহিল—আও হামরে সাথমে। কর্তা বাবুর সাথে ভেট হওয়া চাহি।

বিরাট বৈঠকখানা। সেকালে ত বিজলী বাতি ছিল না, ছিল ঝাড়-লণ্ঠন। বৈঠকখানায় ফরাশ পাতা। বড় বড় তাকিয়া। বাবু অর্ধশায়িত অবস্থায় গড়গড়ার নল টানিতেছেন। তাহার পাশে দুই-তিনজন মোসাহেব বসিয়া মেলার তারিফ করিতেছেন। হরিমোহন-বাবু মৃদু মৃদু হাসিতেছেন। মুখে তাঁহার প্রসন্নতার দীপ্তি। এমন সময় হনুমান চৌবে ঐ খোঁড়া লোকটিকে লইয়া উপস্থিত হইল এবং মাথা নিচু করিয়া কহিল—নমস্তে মহারাজ!

হরিমোহন বাবু কহিলেন—কি চাই হনুমান ?

মহারাজ, এই খোঁড়া লোকটা মেলায় এসেছিল, বাড়ি যেতে পারে নি, বলতা কি, আজ রাতমে হিঁয়া রহেগা, আপকো হুকুম হোনেসে --

হরিমোহন বাবু লোকটার দিকে চাহিয়া বলিলেন—কে রে তুই ? কোথায় তোর বাড়ি ? বল না !

খঞ্জ কাঁদিতে কাঁদিতে কহিল—হুজুর, শান্তিপুরের কাছাকাছি। বামুনডাঙ্গা।

—ওঃ !

একজন বয়স্ক কহিলেন —কি বিদ্‌ঘুটে চেহারা বাবা ! শেওড়া-গাছের ভূতও এমন ভয়ানক নয়।

হরিমোহন বাবু কোনদিকে আর লক্ষ্য করিলেন না। হুকুম দিলেন—হনুমান ! --

জী মহারাজ !

ওকে অতিথিশালায় পাঠিয়ে দে গে যা। তারপর কাছে ডাকিয়া চুপি চুপি কহিলেন—খবরদারি থেকো।

হনুমান চৌবের সঙ্গে খঞ্জ চলিয়া গেল।

দুই

সেদিন অতিথিশালায় আর কোন লোক ছিল না। বেশী লোক থাকিলে তাহাদের জন্য ডাল, চাল, তেল, তরিতরকারী দিয়া সিধা পাঠানো হইত। একে মানুষটা খোঁড়া, তারপর রাত বাড়িতেছে, রান্নাবান্না কে-ই বা করে ! সে ঠাকুরবাড়িতে প্রসাদ পাইল, তারপর ধীরে ধীরে অতিথিশালায় ফিরিয়া গেল।

রাত্রি গভীর হইল। নদীর জলে ঢেউ খেলিতেছে। চূর্ণী নদীর মন্দ মন্দ কুলু কুলু শব্দ ভাসিয়া আসিতেছে। দূরে শোনা যাইতেছে—শেয়ালের হুক্কা-হুয়া রব। মাঝে মাঝে শোনা যাইতেছে—কুকুরের ঘেউ ঘেউ শব্দ। নিস্তব্ধ পল্লী। কোনও সাড়া নাই। দেউড়ির বরকন্দাজেরা খবরদারি করিয়া বেড়াইয়া অবশেষে নীরব হইয়াছে।

এমন সময় খঞ্জ চুপি চুপি অতিথিশালা হইতে বাহির হইয়া নদীর

দিকে গেল। এখন আর সে খঞ্জ নাই। নদীর পারে নৌকাগুলির পাশে আসিয়া দেখিল, চূর্ণী নদীতে জোয়ার আসিয়াছে। জোয়ারের জলে চড়া অল্প অল্প ডুবিয়াছে। সে ধীরে ধীরে নদীর পাড়ে আসিয়া শিস্ দিল। অমনি দশ-বারজন দস্যু নৌকার ভিতর হইতে লাফাইয়া পড়িয়া মশাল জ্বালিয়া পাড়ে উঠিল এবং অতি সন্তর্পণে বাড়ির পেছন দিয়া দেয়াল ডিঙ্গাইয়া ভিতরে পড়িল। ছাতের পাশে কয়েকটি নারকেল গাছ ছিল, সেই গাছ বাহিয়া অনেক দস্যু ছাতের উপর উঠিল। তারপর ছাতের সিঁড়ি বাহিয়া দ্বিতলে আসিয়া ভীষণ ভাবে হল্লা আরম্ভ করিল! যে-ঘরে হরিমোহনবাবু সস্ত্রীক ঘুমাইতেছিলেন, সে ঘরে দুম্ দুম্ করিয়া ঘা মারিতে লাগিল!

ভিতর হইতে হরিমোহন বাবু কহিলেন—এ কি! কেও?

উত্তর আসিল—ডাকাত! দরজা খোল!

হরিমোহন বাবু ভীতকণ্ঠে কহিলেন—সাবধান! দরজা ভেঙ্গো না। আমি দরজা খুলে আসছি, কি চাও শুনবো।

বেশ!

এদিকে বাহিরে দেউড়ির বরকন্দাজেরা ডাকাতদের সঙ্গে লড়িতেছিল। আট-দশজন প্রহরী ও বাড়ীর কয়েকজন ভৃত্য মুক্ত তরবারি হস্তে স্থিরপ্রতিজ্ঞ হইয়া লড়িতেছিল।

কয়েকজন দস্যু মশাল জ্বালিয়াছিল। সেই আলোকে চারিদিক আলোকিত হইয়া গিয়াছিল। হনুমান চৌবে লাঠি খেলায় ও তলোয়ার খেলিতে খুব দক্ষ ছিল—সে প্রথমেই খোঁজ করিল সেই খোঁড়া লোকটার। কিন্তু অতিথিশালায় গিয়া দেখিল, খোঁড়া লোকটা সেখানে নাই। তখন তাহার মনে পড়িল, নিশ্চয়ই লোকটা ডাকাত—ডাকাত-দলের সর্দার! বাইরে বরকন্দাজদের হুকুম দিল—তোমরা লড়, আমি বাবুর খবর করি।

সে তাড়াতাড়ি লাফাইয়া খিড়কির দরজা দিয়া অন্তঃপুরে প্রবেশ করিল এবং দরজা ভাঙ্গিয়া হরিমোহন বাবুর শোবার ঘরের কাছে গিয়া দেখিল, ভয়ানক বিপদ! সেই খোঁড়া এখন আর খোঁড়া নাই। হরিমোহন বাবুকে লক্ষ্য করিয়া সে তলোয়ার ধরিয়াছে।

হরিমোহন বাবু প্রাণপণে লাঠি দিয়া ঠেকাইতেছেন। তাঁহার স্ত্রী থর-থর করিয়া কাঁপিতেছেন এবং স্বামীকে বাঁচাইবার জন্য তাঁহাকে জড়াইয়া ধরিয়াছেন। সে এক সংকটময় মুহূর্ত! এমন সময় হনুমান চৌবে দস্যুর মাথায় মারিল এক তলোয়ারের ঘা, সে আঘাতে ডাকাত পড়িয়া গেল। রক্তে ঘর ভাসিয়া গেল।

সর্দারকে এইভাবে পড়িয়া যাইতে দেখিয়া চারিজন ডাকাত একসঙ্গে আসিয়া হনুমানকে আক্রমণ করিল। হনুমান এক হাত দিয়া হরিমোহন বাবুকে ও তাঁহার স্ত্রীকে ঘরের ভিতর ঠেলিয়া দিয় ঐ চারিজন দস্যুর সহিত একা লড়িতে লাগিল। সে হনুমানেরই মত লাফ দিয়া উঠিয়া এমন দ্রুতগতিতে তলোয়ার ঘুরাইতেছিল যে, একজন দস্যুও তাহার সঙ্গে আঁটিয়া উঠিতে পারিতেছিল না। তাহার সঙ্গে লড়িবার মত হাতিয়ার ধরিতে দক্ষ ডাকাতদের মধ্যে কেহই ছিল না; কাজেই কেহ মরিল, কেহ হাত-পা কাটা অবস্থায় পড়িয়া রহিল।

বাহিরেও বহু লোকজন মিলিত হইয়া ডাকাতদের বাধা দিতে-ছিল। নৌকারোহীরা নৌকা থামাইয়া উপরে আসিয়া দস্যুদের সঙ্গে যুদ্ধ করিতে লাগিল। ডাকাতেরা কিছুতেই আঁটিয়া উঠিতে পারিল না। কেহ পলাইল, কেহ ধরা পড়িল। সর্দার বলিয়া হনুমান চৌবে যাহাকে কাটিয়া ফেলিয়াছিল, সে কিন্তু সর্দার নয়; সে ছিল দস্যুদের অন্যতম নেতা। নাম ছিল তাহার বলরাম সর্দার। ডাকাতদলের প্রকৃত সর্দার ছিল হরিশ ঘোষ। তাহার বাড়ি ছিল শান্তিপুর।

হনুমান চৌবে যে-ভাবে প্রভুর জন্য লড়াই করিয়াছিল, তাহার তুলনা মিলে না। গ্রামের লোকেরা ধৃত ও মৃত দস্যুদের যে-যেখানে পড়িয়াছিল, তাহাদের সেইভাবেই রাখিয়া দিল। হরিমোহন বাবু হৃদয়ে বল সঞ্চার করিয়া বৈঠকখানায় আসিলেন। থানায় ও জেলায় সংবাদ পাঠানো হইল। হনুমান চৌবে লড়াই করিতে করিতে অবসন্ন দেহে মূর্ছা গিয়াছিল। হরিমোহনবাবু ও তাঁহার স্ত্রী নিজেদের হাতে তাহার সেবা-শুশ্রূষা করিলেন।

তিন

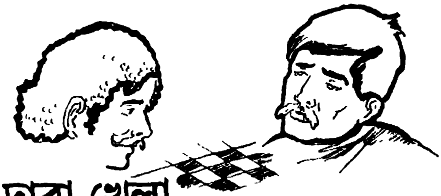
সেই সময়ে নদীয়া জেলার ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন ব্ল্যাকোয়ার সাহেব (Mr. Blaquire)। ব্ল্যাকোয়ার সাহেবকে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী দস্যু-দমনের জন্য বিশেষভাবে নিযুক্ত করেন।* প্রথমে তাঁহাকে নদীয়ার ন্যায় দস্যু-ডাকাত-পীড়িত স্থানের ম্যাজিস্ট্রেট করা হইয়াছিল। ব্ল্যাকোয়ার সাহেব বাংলাদেশের লোকের আচার-ব্যবহার জানিতেন। তিনি ও তাঁহার সহকারী পি. এগুজি দস্যু-দমনে অনেকটা কৃতকার্য হইয়াছিলেন। তিনি গোয়েন্দা ও সর্দার নিয়োগ করিয়া নদীয়ার নানা স্থানের দস্যু-দমনে সমর্থ হইয়াছিলেন।

সাহেব হরিমোহন বাবুর বাড়ির ডাকাতির সংবাদ শুনিলেন এবং তৎক্ষণাৎ সেখানে গিয়া জানিতে পারিলেন, এ শান্তিপুরের কুখ্যাত দস্যু হরিশ ঘোষের কাজ। ব্ল্যাকোয়ার সাহেব ছিলেন অদম্য সাহসী ও অসাধারণ ব্যক্তি। তিনি হরিশ ঘোষকে গ্রেপ্তার করিলেন। সে নিরুপায় হইয়া অপরাধ স্বীকার করিল। শান্তিপুরের একটি মামলায় এবং হরিমোহন বাবুর বাড়িতে ডাকাতির ফলে তাহার কঠোর সাজা হইয়াছিল।

হরিমোহন বাবু তাঁহার প্রিয় সাহসী দরোয়ান হনুমান চৌবেকে সোনার মালা গড়াইয়া নিজ হাতে পরাইয়া দিয়াছিলেন এবং জমিজমা দিয়াছিলেন। তাহার বংশধরেরা এখনও সেই জমিজমা ভোগ করিতেছে। হনুমান চৌবে নিজ জীবন বিপন্ন করিয়া যে-ভাবে প্রভু ও প্রভুপত্নীর জীবন রক্ষা করিয়াছিল, সে-সংবাদ সেকালের সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইয়াছিল এবং সরকার হইতেও তাহাকে ১০০ টাকা পুরস্কার দেওয়া হইয়াছিল।

---

*The vigorous administration of Mr. Blaquire, first as Magistrate of Nadia, and later as Superintendent (or Inspector General) of Police, *had the effect of practically* **ridding the district of dacoits by the end of the first decade of the nineteenth century**—Bengal District Gazetteers, Nadia, Page—120.



ডাকাতের দাবা খেলা

এক

পদ্ম গুপ্ত—পুরা নাম পদ্মলোচন গুপ্ত। গায়ের রং কালো বটে কিন্তু শরীর মোটা-সোটা! বয়স পঞ্চাশের উপর। দিনাজপুর শহরে ওকালতি করেন। বাড়ি বিক্রমপুর—গুণগাঁও নামে একটি বর্ধিষ্ণু গ্রামে। সে গ্রাম আর নাই, অনেক দিন হইল পদ্মার বুকে তাহ লুপ্ত হইয়াছে।

পদ্ম গুপ্ত বেশ বড়লোক। সেকালে যাঁহারা ওকালতি করিতেন, সকলেই বেশ দুই পয়সা উপার্জন করিতেন। পদ্ম গুপ্তের তালুকমূলুক হইতেও বেশ আয় হইত। মেজাজ ছিল চড়া, এক কথায় বলা চলে রগ-চটা। সহজেই রাগিয়া উঠিতেন—আবার চুপ-চাপ। দপ্‌ করিয়া জ্বলিয়া উঠিতেন, আবার সহজেই সে আগুন নিবিয়া যাইত। পূজার সময় বাড়ি আসিতেন। দুর্গাপূজা ঘটা করিয়া করিতেন। গরীব-দুঃখীদের সে-সময় ছিল তাঁহার বাড়িতে দুইবেলা মায়ের প্রসাদ পাওয়ার নিমন্ত্রণ। সেকালের প্রথমত, গ্রামবাসীদের অনুরোধে উপরোধে হইত কবিগান অথবা যাত্রাগান। কৃষ্ণ-যাত্রাই ছিল তাঁহার বিশেষ প্রিয়। পদ্ম গুপ্ত কবে বাড়ি আসিবেন, সেজন্য সকলেই উৎসুক হইয়া থাকিত; আমুদে লোক, হাসি-তামাসা, গান-বাজনা চলিত দিনরাত্র! প্রাচীনেরা দাবা-পাশার আসর লইয়া বসিতেন। বৃদ্ধ হইলেও হার-জিতের সময় তাঁহারা এমন চেঁচামেচি করিতেন যে, ছেলেদের কলহ ও মারামারির হৈ-হল্লাও তাঁহার কাছে হার মানিত।

পদ্ম গুপ্ত দাবা খেলিতে অত্যন্ত ভালবাসিতেন! সেই খেলার সময় তাঁহার কোন খেয়ালই থাকিত না। খেলার সাথী ছিলেন নন্দকুমার বিদ্যালঙ্কার। বিদ্যালঙ্কার তাঁহার বাল্যবন্ধু। এক গ্রামে

বাড়ি। বিদ্যালঙ্কার পণ্ডিত মানুষ—দিনাজপুরে চতুষ্পাঠী খুলিয়া ঠিকুজী, কোষ্ঠী, লিখিয়া বেশ তুই পয়সা রোজগার করিতেন। সন্ধ্যার পর মক্কেলের কাজ সারিয়া তুই বন্ধু বসিতেন দাবা খেলিতে। রাত বাড়িয়া চলিত, ভাত ঠাণ্ডা হইত ; গুপ্ত-গৃহিণী রাগিয়া টং হইতেন। ভৃত্য আসিয়া বলিত—কর্তা! পদ্ম গুপ্ত গর্জিয়া বলিতেন—যা! যা!—কি কর্তা কর্তা করছিস্? এখন তোর কাগজপত্র দেখব না—যা-যা…। বিদ্যালঙ্কার, এইবার তোমার ঘোড়া সামলাও—

বিদ্যালঙ্কার টিকি নাড়িয়া হুঙ্কার দিয়া বলিতেন—বড়ে ত ছাড়—সামলাও ত ঘোড়া—হুঁ!

কোনদিন তুই বন্ধুতে হার-জিত লইয়া হাতাহাতি হইবার উপক্রম হইত—রাত্রি তুপুরও হইত! এমনি ছিল তুই জনের দাবাখেলার নেশা।

পদ্ম গুপ্তের ভৃত্য রামচরণ নিরুপায় হইয়া বেড়ার পাশে বসিয়া ঘুমাইয়া পড়িত ; তাহার নাক ডাকিত। ঐদিকে ভাত হইত ঠাণ্ডা, ব্যঞ্জন হইত অখাদ্য। এ-হেন পদ্ম গুপ্ত অন্দরে গিয়া গৃহিণীর কাছে হইতেন শান্তশিষ্ট সুবোধ ভদ্রলোক। গৃহিণী বলিতেন—এ নেশা ছাড় বলে দিচ্ছি! রামচরণকে ডাকতে পাঠালেম, তবু এলে না। আমরা কি সারা রাত্তির জেগে থাকব? এ কি কাণ্ড বল ত!

নির্বিকার ভাবে পদ্মলোচন বলিতেন—কোথায় রামচরণ? সে বোকা গেলে কি আমি তোমার ডাকে না এসে থাকতে পারি?

গৃহিণী হাসেন। রামচরণ কাঁদ-কাঁদ স্বরে বলিত—মা ঠাকরুণ, কর্তারে ডাকি ডাকি হয়রান হলেম। কথাই শুন্‌তি চান না—

খড়ম লইয়া গর্জিয়া উঠেন গুপ্ত মহাশয়—এখনি তোকে তাড়িয়ে দেব—বেটা মিথ্যাবাদী!

রোজই এমন ঘটনা হয়। কি যে তাঁহার দাবাখেলার ঝোঁক! অবসর পাইলেই দাবা নিয়া বসেন।

এইভাবেই পূজার আমোদ-প্রমোদ শেষ হইল। তাঁহার বাড়ির পাশে বড় খালে মায়ের বিসর্জন হইল। ঢাক বাজিল, ঢোল বাজিল। পদ্ম ও নন্দ, তুই বন্ধু একবার পূজার মণ্ডপে বিসর্জনের সব

আয়োজন করিয়া, দেবীকে শেষ প্রণাম করিয়া—আসিয়া বসিলেন দাবা খেলিতে ! রাত ভোর হইল—তবু খেলাই চলিতেছে। গ্রামে একদল ছিল বিদ্যালঙ্কারের পক্ষে আর একদল ছিল গুপ্তমহাশয়ের পক্ষে। খেলার এই আনন্দে—এই হার-জিতে তাহারাও আনন্দ পাইতেন।

দুই

দুর্গাপূজা, লক্ষ্মীপূজা, কালীপূজা শেষ করিয়া পদ্ম গুপ্ত সপরিবারে দিনাজপুর যাত্রা করিলেন।

দুইখানি বড় পানসী নৌকা ! একখানিতে ছেলেমেয়ে সব, পদ্ম গুপ্তের পত্নী ও বিদ্যালঙ্কারের ব্রাহ্মণী এবং দাসী-চাকর। আর একখানিতে পদ্ম গুপ্ত ও বিদ্যালঙ্কার দাবা লইয়া বসিয়াছেন। সঙ্গে কয়েকজন জোয়ান জোয়ান লাঠিয়াল। সেকালে ডাকাতের ভয় ছিল খুব বেশি। সেজন্য সতর্ক হইয়া চলিতে হইত। ছোট দুইখানা ডিঙ্গি নৌকা ছিল পানসীর সঙ্গে বাঁধা। তাহাতে রান্নাবান্না হইত।

তখনকার দিনে গ্রামে গ্রামে হাট-বাজার বসিত। যেখানে লোকসমাগম, হাট বাজার, বন্দর, সেখানে নৌকা ভিড়াইয়া মাছ তরিতরকারী সংগ্রহ করা হইত। অমৃতের মত স্বাদ হইত সে অন্ন-ব্যঞ্জনের ! রন্ধননিপুণা বিদ্যালঙ্কার-গৃহিণী ও গুপ্তজায়ার পরিচালনায় হইত রান্না। ভোজন আর গালগল্পের মধ্য দিয়া জোয়ার-ভাটায় নৌকা চলিত। পদ্মার জল ছল-ছল কল-কল করিয়া ছুটিয়া চলিত। আকাশের গায়ে সান্ধ্য মেঘ ভাসিয়া চলিয়াছে। কে দেখে সেই শোভা-সম্পদ্ ! গড়গড়ার নল আর নস্যির শামুক হাতে গুপ্ত ও বিদ্যালঙ্কার খেলেন দাবা। তাহাতেই তাঁহাদের আনন্দ ও উৎসাহ।

পদ্মলোচন গুপ্তের মাঝির নাম ছিল গোলোক মাঝি। বরাবর সেই এই পথে গুপ্তমহাশয়কে নিয়া আসা-যাওয়া করে। সে জানিত কোন্ খাল ধরিয়া গেলে সোজাসুজি যাওয়া যায়, কোথায় কোন গঞ্জ বা বন্দর আছে, সে-সকলের সংবাদ সে যেমন রাখিত, তেমনি

কোন্ পথে, কোন্ জায়গায় ডাকাতদের আড্ডা সে-কথাও তাহার অজানা ছিল না। সে-সব জায়গায় পূর্ব হইতেই সে হুঁশিয়ারি করিত। তবু কয়েকবার তাঁহাদের ডাকাতের হাতে পড়িতে হইয়াছিল ; তবে ধনেপ্রাণে রক্ষা পাইয়াছেন। গোলোক মাঝির অনেক গুণ ছিল। সে ছিল গল্পের রাজা। এমন সব গল্প বলিত যে, সেই সব অবিশ্বাস করার সাধ্য ছিল না। আমাদের বাল্যকালে গোলোক মাঝির গল্প শুনিয়াছি, তখন তাহার বয়স হইয়াছিল একশো বছরের কাছাকাছি। আমরা যদি বলিতাম, মাঝি দাদা, চলন বিলের গল্প বল না। অমনি বলিত, তবে শোন্ তা। তাহার ডাকাত তাড়াইবার বিক্রম, আর চলন বিলের দু'মনি রুই মাছ, দুই হাত বড় কই মাছের গল্প বলিতে বলিতে, সেকালের অনেক কথা বর্ণনা করিত। অবিশ্বাস করার কি জো ছিল ? কখনও কোন কথার প্রতিবাদ করিলে রাগিয়া বলিত—যা—যা, তোরা আর কি দেখেছিস্! অতি চমৎকার গল্প বলিবার ক্ষমতা ছিল গোলোক মাঝির।

নৌকাপথে চলিতে চলিতে গোলোক মাঝি মাঝে মাঝে গুপ্ত ও বিদ্যালঙ্কারের কাছে আসিয়া বসিত এবং কীর্তনের সুরে গান ধরিত—

কেন দাবা খেলতে এলি বল,
এতে কমে যে তোর এলো বল।

গুপ্ত মহাশয় রাগিয়া বলিতেন—গোলোক দাদা, যাও ত ভাই—এই চালে যে ভুল হলো রে—অমনি গোলোক একটু সরিয়া বসিয়া গাহিত—

ছি ছি না জেনে চাল, হবি বেচাল রে,
ও তোর বিপক্ষ হ'ল প্রবল।
তুই বড়ের লোভে চাললি দুই ঘোড়া—
ও তোর কপাল পুড়ে চাপায় পড়ে গেল রে মারা !

আর যায় কোথায়—বিদ্যালঙ্কার টিকি নাড়িয়া পাশের খড়ম লইয়া করিতেন তাড়া—যা—যা—হাল ধরগে যা।

পদ্ম গুপ্ত গম্ভীরভাবে হুঙ্কার দিতেন—নিকালো হিঁয়াসে।

গোলোক হাসিয়া আবার নৌকার হালে গিয়া বসিত।

তিন

দিনগুলি নিরাপদে নির্ঝঞ্ঝাটে কাটিতেছিল। পরে আসিয়া পড়িল চলন বিল। সেকালের চলন বিল কেমন ছিল, সে কল্পনাও তোমরা করিতে পারিবে না। সে যেন সমুদ্রের ছোটখাট খোকা। সাগরের মত তাহার বিস্তার—জল থৈ-থৈ করে! ঢেউ উঠে সাগরের মত। কত নৌকা যে ডোবে, কত ডাকাতি যে হয় চলন বিলে, কে তাহার সন্ধান রাখে!

গোলোক মাঝি এখানে দল বাঁধিয়া অন্যান্য যাত্রীদের নৌকার সঙ্গে বাহিয়া চলিল। সন্ধ্যাবেলা। সূর্য ডুবিয়া গিয়াছে অনেকক্ষণ। অন্ধকার চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িয়াছে। চলন বিলের জল কালো হইয়া গিয়াছে। সহসা ঈশান কোণে একটা মেঘ দেখা দিল। দেখিতে দেখিতে সে ক্ষুদ্র মেঘ ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইয়া সারা আকাশ ছাইয়া ফেলিল। একটা দমকা হাওয়া তীরের মত বেগে নৌকাগুলিকে লইয়া চলিল—অজানা দিকে। গোলোক ও তাহার সঙ্গী মাঝিরা হালে থাকিয়াও কিছু করিতে পারিল না। প্রবল তরঙ্গে নাচিতে নাচিতে দুলিতে দুলিতে সেগুলি শেষটায় গিয়া ঠেকিল বিলের পাড়ের একটি বড় বাড়ির সম্মুখে। স্ত্রীলোকেরা কাঁদিতেছিলেন প্রাণের ভয়ে, মাঝিরাও হতভম্ব হইয়া পড়িয়াছিল। বিধাতা প্রাণে বাঁচাইলেন বলিয়া সকলে তখন ভগবানকে ধন্যবাদ দিতে লাগিলেন।

আশ্চর্য প্রকৃতির বিদ্যালঙ্কার ও পদ্ম গুপ্ত। তাঁহারা এতক্ষণ খেলা বন্ধ হওয়ার জন্য দুঃখিত ছিলেন, এইবার ঝড়-ঝঞ্ঝা থামিয়া গিয়াছে বলিয়া নিশ্চিন্ত মনে দুইজনে বেশ বড় দুইটি লণ্ঠন জ্বালাইয়া দাবা আর বড়ে লইয়া বসিলেন। মাঝি-মাল্লারা নৌকা বাঁধিয়া রান্নাবান্না আরম্ভ করিয়া দিল। এই বিপদ হইতে মুক্ত হইয়াছেন বলিয়া সকলের মুখে হাসি!

খেলা চলিতেছে। দুইজনে খেলার ভিতর ডুবিয়া গিয়াছেন। এমন অবস্থায় কখন কোন্ সুযোগে যে একজন লোক নৌকার উপরে উঠিয়া তাঁহাদের খেলা লক্ষ্য করিতেছিলেন সেদিকে তাঁহারা লক্ষ্য করেন নাই।

লোকটি দীর্ঘকায়, গৌরবর্ণ ও বলিষ্ঠ। গায়ে ফতুয়া। ফতুয়ার আড়াল হইতে পৈতার গোছা বাহির হইয়া পড়িয়াছে। মাথায় বড় বাবরি চুল, সেকালের ভদ্রলোকের মত। হাতে একখানি তলোয়ার। পাড়ে চারি-পাঁচজন লোক লাঠি-সড়কি হাতে দাঁড়াইয়াছিল। মাঝি-মাল্লারা দেখিতে পাইয়া ভয়ে কাঁপিতেছিল। স্ত্রীলোকেরা আতঙ্কিত হইয়া রান্নার নৌকা হইতে পানসী নৌকাতে আসিয়া আশ্রয় লইলেন। আকাশ তখন পরিষ্কার হইয়াছে। তারা ফুটিয়াছে। ঝড়ো হাওয়ার মত বেগে হাওয়া বহিতেছে। এমন সময় কে যেন চীৎকার করিয়া বলিল—কি খেলছো, পণ্ডিত গজ তু'টি যে গেল।

তুইজনে সবিস্ময়ে চাহিয়া দেখিলেন ভীষণদর্শন মূর্তি। তাহারা বলিয়া উঠিলেন—কে—কে—আপনি?

উত্তর হইল—আমি হরি বাগচি। ডাকাতও বটি, জমিদারও বটি। তুই ব্যবসাই আমার চলে। এখানে কি করে এলে বল।

—আজ্ঞে, আজ্ঞে—ভুলপথে ঝড়ে নিয়ে এসেছে। তাই—

—জান না, বিলের মধ্যে এই ডাঙ্গা। এ-ডাঙ্গাকে বলে ডাকাতের ডাঙ্গা। ডাকাতের ডাঙ্গায় এসেছ মরতে! আমরা যাচ্ছিলাম শিকার খুঁজতে, ঐ দেখ আমার লোকজন—বাড়িতেই জুটল শিকার। এই বলিয়া হাসিলেন হরি বাগচি। কি বিকট হাসি —হা—হা—

বিদ্যালঙ্কার স্তবস্তুতি আরম্ভ করিলেন। পদ্ম গুপ্ত বলিলেন—আমরা স্ত্রী-পুত্র নিয়ে যাচ্ছি দিনাজপুরে। আপনি ব্রাহ্মণ, জমিদার। আপনার বিবেচনার উপরই সব নির্ভর করে।

—দেখ,—এক শর্তে আমি তোমাদের প্রাণরক্ষা করব। আমার সঙ্গে দাবা খেলতে হবে। যদি খেলায় আমাকে হারাতে পার—তবে তোমরা প্রাণে বাঁচবে, নইলে আমি জিতলে তোমাদের রক্ষা নেই। হাতের তলোয়ারখানি তুলিয়া বলিলেন—কচি বাচ্চা, মেয়ে, পুরুষ কারো প্রাণ রাখব না—কেটে কুচি কুচি করে ফেলে দেব বিলের জলে। বল কি করবে? বল!

বিদ্যালঙ্কার চোখের জল ফেলিতে ফেলিতে বলিলেন—যদি আমরা হারি তবে যে—

—তবে-যে তবে-যে কেন করো ঠাকুর? আমার যে কথা সেই কাজ। কি বল তুমি?

পদ্ম গুপ্ত বলিলেন—বেশ কথা। যদি হারেন তবে ত আমাদের প্রাণে বাঁচাবেন, আর নিরাপদে পৌছবার ব্যবস্থা করে দেবেন?

আলবং! আলবং! বলিয়া হুঙ্কার দিলেন হরি ডাকাত, ওরফে বাগচি মহাশয়; আমার কথার নড়চড় নেই, চল আমার বৈঠকখানায়।···ওরে শোন্ তোরা—এখানে পাহারা থাক, মাঝিরা যেন নৌকা নিয়ে না পালায়।···মাঝিরা— তোরা সব নিশ্চিন্ত মনে রান্নাবান্না করে খা!

চার

হরি ডাকাত ছিলেন পাকা দাবা-খেলোয়াড়। সে তল্লাটে তাঁহার মত দাবা-খেলোয়াড় কেহ ছিল না। তাহার চরিত্রেরও এই ছিল দুর্বলতা। দক্ষ দাবা-খেলোয়াড়দের সঙ্গে খেলিতে ভালবাসিতেন। হারিলেও খেলোয়াড়জনোচিত সহৃদয়তা দেখাইতেন। যে-কোন নৌকাযাত্রী তাহার হাতে পড়িত, তাহার সঙ্গেই দাবাখেলার প্রস্তাব করিতেন। মন্দের ভাল বলিতে হইবে।

পদ্ম গুপ্ত ও বিদ্যালঙ্কার পাড়ে উঠিলেন। সামান্য একটু পথ যাইতেই সম্মুখে দেখা গেল বিরাট চকমিলান বাড়ি; কালিমন্দির, পূজার মণ্ডপ, বৃহৎ বৈঠকখানা, নাটমন্দির। বৈঠকখানায় তক্তপোশের উপর ফরাস পাতা, বহু বড় বড় ঝাড়লণ্ঠন। হরি ডাকাতের আদেশে ভৃত্যেরা ঝাড়লণ্ঠন জ্বালিয়া দিল। তিনি আদেশ দিলেন—বাড়ির ভিতরে গিয়ে বল পনেরো জনের খাবার আয়োজন করতে। আর মাঝি-মাল্লাদের ও মা-ঠাকরুণদের বল যে আমার এখানেই সব ব্যবস্থা হয়েছে। তাদের আর কষ্ট করে রান্নাবান্না করতে হবে না।

ডাকাত হইলে কি হইবে, এদিকে এইরূপ বদান্যতাও ছিল।

খেলা আরম্ভ হইল। প্রথমে খেলিতে শুরু করিলেন পদ্মলোচন। বহুক্ষণ খেলা চলিল। দৈব সহায়; হরি ডাকাত হারিলেন, জয়ী হইলেন পদ্ম গুপ্ত। আশ্চর্য-স্বভাব হরি বাগচির। তিনি মহা উৎসাহে গুপ্তের পিঠে চাপড় মারিয়া বলিলেন—সাবাস্! সাবাস্!

এইবার বিদ্যালঙ্কারের পালা। বিদ্যালঙ্কার এতক্ষণ খেলার চাল লক্ষ্য করিতেছিলেন। খেলায় বিদ্যালঙ্কারও জয়ী হইলেন। দৈব হইয়াছিল তাঁহাদের সহায়! আবার বাগচি মহাশয় খেলিলেন পদ্ম গুপ্তের সহিত, হারাইতেই হইবে তাহাকে।

দুই জনেই সুনিপুণ খেলোয়াড়। শেষটায় স্থান-কাল-পাত্র ভুলিয়া অমোঘ চালে ডাকাত বাগচিকে হারাইয়া দিয়া উল্লাসে চীৎকার করিয়া উঠিলেন গুপ্ত—কিস্তিমাৎ। কিস্তিমাৎ! কিস্তিমাৎ!

বিজয়ী পদ্ম গুপ্তকে আলিঙ্গন করিলেন হরি ডাকাত। তিনি তাঁহার প্রতিশ্রুতি রক্ষা করিলেন।

অনেক দিন পরের কথা। পদ্ম গুপ্তের বৈঠকখানায় বৃদ্ধ বিদ্যালঙ্কার ও পদ্ম গুপ্তের সহিত একজন বলিষ্ঠকায় বৃদ্ধকে মাঝে মাঝে দাবা খেলিতে দেখা যাইত—কেহ জানিত না যে সে-ই হরি ডাকাত।

দিনাজপুর আসিলে প্রায়ই তিনি পদ্ম গুপ্তের আসরে আসিতেন। পরে বেশ বন্ধুত্ব হইয়াছিল পরস্পরের মধ্যে! তখন আর হরি বাগচি ডাকাতি করিতেন না। চলন বিল ছাড়িয়া রাজসাহী জেলায় কোন গ্রামে বাড়িঘর করিয়া, শান্তশিষ্ট দানশীল ভদ্রলোক বলিয়া পরিচিত হইয়াছিলেন।



জলসোরার ডাকাত

এক

হুগলী জেলায় জলসোরা গ্রাম। কলিকাতা হইতে প্রায় পঞ্চাশ মাইল দূর। জলসোরা গ্রাম একটি প্রসিদ্ধ পল্লী—এখানে ছিল বহু ব্রাহ্মণ ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির বাস। ঐ গ্রামে বহু ধনী ব্যক্তিও ছিলেন এবং বিখ্যাত জমিদার ছিলেন রামনারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়।

রামনারায়ণ বাবু শারদীয়া পূজার সময় কলিকাতা আসিতেন এবং নিজে পূজার জন্য কাপড়-চোপড় এবং বহু জিনিসপত্র কিনিয়া দেশে যাইতেন। বড় ধূমধামের সহিত দুর্গাপূজা ও কালীপূজা করিতেন। সেই সময়ে তিনি গরীব-দুঃখীদের ভোজন করাইতেন এবং তাহাদের মধ্যে কাপড়-চোপড় বিতরণ করিতেন। সত্য সত্যই রামনারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায় ছিলেন সাধু-সজ্জন লোক, গ্রামবাসীরা ছিলেন হিতকারী বন্ধু। যে-কোন আপদে-বিপদে, সুখে-দুঃখে তাঁহার কাছে আসিলেই গ্রামবাসীরা পাইত সাহায্য। এজন্য তিনি ছিলেন সকলের প্রিয় ও শ্রদ্ধাভাজন ব্যক্তি। কেহ তাঁহার অনিষ্ট চিন্তা করিত না। এমন কি হুগলী জেলার ডাকাতদলও তাঁহার বাড়িতে কোনদিন ডাকাতি বা কোন অত্যাচার করে নাই। বিরাট বাড়ী—লোকজন সর্বদা হৈ-হৈ করিত। দীঘি, খাল, ধানের ক্ষেত, তালের বাগান, নানাবিধ শস্যের উঁচু-নিচু জমির সমাবেশে দূর হইতে গ্রামখানিকে দেখাইত অতি সুন্দর।

দুর্গাপূজার ও কালীপূজার সময় গ্রামের বঙ্কিনী দেবীর মন্দিরের পাশে বসিত মেলা। মেলায় আসিত নানা দেশের লোকজন। নানা রকম জিনিসপত্র ক্রয় বিক্রয় হইত।

১৮৫০ খৃষ্টাব্দের কথা। সেবার পূজার সময় রামনারায়ণ বাবু তাঁহার ছোট ভাই দেবনারায়ণকে সঙ্গে লইয়া কলিকাতা হইতে বাড়ি চলিয়াছেন। জিনিসপত্র বজরায় উঠিতেছে। রামনারায়ণ বাবু বজরার উপর একখানা মোড়ায় বসিয়া আছেন। তাঁহার ছোট ভাই সব দেখিয়া শুনিয়া ফর্দ করিয়া লোকজন দ্বারা জিনিস-পত্র তুলিতেছেন।

বেলা শেষ হইয়া আসিয়াছে। এমন সময় একজন ব্রাহ্মণ আসিয়া রামনারায়ণ বাবুকে নমস্কার করিয়া জোড় হাতে দাঁড়াইয়া রহিলেন। রামবাবু তামাক খাইতে খাইতে জিজ্ঞাসা করিলেন—মহাশয়ের কি কোন প্রয়োজন আছে?

ব্রাহ্মণ করজোড়ে কহিলেন—আমি দরিদ্র ব্রাহ্মণ, কিছু প্রার্থনা করি।

রামনারায়ণ বাবু ব্রাহ্মণকে একটি টাকা দিলেন।

ব্রাহ্মণ হাসিমুখে জয় হোক রাজাবাবুর, বলিয়া চলিয়া গেলেন।

ব্রাহ্মণ চলিয়া যাইবার কিছু পরে গলিপথে আসিতেছিল একজন বজরার মাঝি। তখনকার দিনে কলিকাতার গলিতে তেমন আলো ছিল না। মিট-মিট করিয়া জ্বলিত কোরোসিনের ল্যাম্প। অনুজ্জ্বল ছিল তাহাদের দীপ্তি।

গলিপথে মাঝির সঙ্গে দরিদ্র ব্রাহ্মণের দেখা হইল, মাঝি বলিল —ঠাকুরমশাই ইনি মস্তবড় ধনী—জলসোরার জমিদার। আমরা রাত্রিতেই রওনা হ'ব—বুঝেসুজে আসবেন। আমরা জোয়ারের সময় নৌকা ভাসাব।

ব্রাহ্মণ চলিয়া গেলেন। মাঝিও তাহার গামছাখানিতে কিছু চাল-ডাল, তরিতরকারি লইয়া নৌকায় ফিরিল।

সন্ধ্যার পর রামনারায়ণ বাবুর বজরা ছাড়িয়া দিল। দাঁড়ী মাঝি সকলে দ্রুত বজরা চালাইতে আরম্ভ কবিল। নদীতে জোয়ার আসিয়াছিল। নৌকা তর-তর করিয়া ছুটিয়া চলিল। সঙ্গের ছোট নৌকাটিতে পাচক ব্রাহ্মণ রান্না করিতেছিল। রামনারায়ণ বাবু বজরার কক্ষে বসিয়া দীপালোকে মহাভারত পড়িতেছিলেন।

দুই

সেই যে ব্রাহ্মণ আসিয়াছিল রামবাবুর কাছে ভিক্ষা করিতে তাহার নাম ছিল রামঠাকুর—কলিকাতার বিখ্যাত ডাকাত।* তাহার দলে ছিল বহু লোক। হুগলী, বর্ধমান, নদীয়া জেলার সর্বত্র সে ডাকাতি করিত। বহুকাল পর্যন্ত সে ধরা পড়ে নাই। সে ও তাহার দলের লোকেরা ঘাটের মাঝি, দোকানী, এমন সব লোকজনের কাছ হইতে ডাকাতি করিবার খোঁজখবর লইত। জলসোরা গ্রামের রামনারায়ণ বাবুর সব সন্ধান লইয়া সে প্রস্তুত হইল ডাকাতি করিতে। সে তাহার সঙ্গে লইল তাহার অধীনস্থ দুই জন বিখ্যাত সর্দার শেখ কালু, আর ঈশ্বর বাগ্দীকে। ইহারা ছিল রামঠাকুরের সঙ্গী বা চেলা। ছিপ নৌকাতে চলিল দলের প্রায় কুড়ি জন ডাকাত। পথে তাহারা কিছুই করিল না—বজরার পিছনে পিছনে চলিল একটু দূরে দূরে থাকিয়া।

রামঠাকুর এদিকে তাহার চেলাদের মধ্যে কয়েক জনকে দলের লোকদের সংবাদ দিতে নানা স্থানে পাঠাইয়া দিয়াছিল।

রামনারায়ণ বাবুর বজরা চলিয়াছে। জলসোরার খালের মধ্যে বজরা ঢুকিবামাত্রই হঠাৎ রামঠাকুরের দলের ডাকাতেরা বজরা আক্রমণ করিল। 'হা-রে-রে-রে' শব্দে পল্লীগ্রামের নিস্তব্ধতা ভাঙ্গিয়া গেল। রামনারায়ণ বাবু জাগিয়া উঠিবার পূর্বে তাঁহার ছোট ভাই উপর্যুপরি বন্দুক ছুড়িতে লাগিলেন। ডাকাতদের কাহারও গায়ে বড় একটা লাগিল না। তাহারা ছিপ ফিরাইয়া নিয়া গঙ্গায় পড়িল এবং অল্পক্ষণ মধ্যে অদৃশ্য হইয়া গেল।

রামনারায়ণ বাবু নির্বিঘ্নে বাড়ি পৌঁছিলেন। তাঁহার নৌকা যে ডাকাতেরা খালের মুখে আক্রমণ করিয়াছিল, সে-কথা গ্রামবাসীদের কাছে বলিলেন। গ্রামের লোকেরা চকিত ও সন্ত্রস্ত হইয়া পড়িল।

---

* সরকারী রিপোর্টে তাহার সম্বন্ধে লেখা আছে···a very celebrated Brahmin dacoit, named Ram Thakoor, who had lived in Calcutta for many years and committed dacoity in the neighbouring districts with perfect impunity.—P. 70 of *Suppression of Dacoity in Bengal.*

চারিদিকে লোকজন ও প্রহরীর ব্যবস্থা হইল। থানা হইতে পুলিশ ও দারোগা আসিল। বড়লোকের বাড়ি; সেইজন্যই সকলে সতর্ক হইলেন—ডাকাতদের দমন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন।

তিন

পূজা শেষ হইয়া গিয়াছে। কালীপূজা আসিল। কৃষ্ণপক্ষের রাত্রি। ভয়ানক দুর্যোগ। ঝড়বৃষ্টির কামাই নাই। ঘন ঘন মেঘ ডাকিতেছে। পল্লীগ্রামের চারিদিক অন্ধকার। বৃষ্টির জন্য লোকজন বড় কেহ বাহিরে নাই। এমনি দুর্যোগের দিনে রামনারায়ণ বাবুর বাড়ির দেওয়াল টপকাইয়া ডাকাতদল প্রবেশ করিল এবং ভীষণভাবে ডাকাতি করিল।

ডাকাতেরা দরজার কপাট ভাঙ্গিয়া ঘরে ঢুকিল তারপর বাক্স-সিন্দুক ভাঙ্গিয়া জিনিসপত্র লুণ্ঠন করিল। এই ডাকাতিতে বর্ধমান, চন্দননগর, হুগলী প্রভৃতি নানা অঞ্চলের ডাকাতেরা মিলিত হইয়াছিল। তাহারা সংখ্যায় ছিল প্রায় দুই শত। জমিদার বাড়ির সর্বত্র তাহারা 'হা-রে-রে-রে' চিৎকার করিয়া এবং গ্রামের এখানে-সেখানে মশাল জ্বালিয়া ভয়ানক অশান্তির সৃষ্টি করিয়া চলিয়া গেল নিরাপদে। রামনারায়ণ বাবুকে হাতে পায়ে বাঁধিয়া ঘরের মধ্যে ফেলিয়া রাখিয়া গিয়াছিল। তিনি গোঁ-গোঁ শব্দ করিতেছিলেন। ভ্রাতা দেবনারায়ণ বারান্দায় অচেতন হইয়া পড়িয়াছিলেন।

এইরূপ সাংঘাতিক ডাকাতি করিয়া ডাকাতেরা নিরাপদে প্রস্থান করিল। আশ্চর্যের বিষয় এই যে, গ্রামের লোকেরা দারুণ দুর্দিনে—ঝড়ের তাণ্ডব-নৃত্যে এই দুঃসংবাদ জানিতে পারে নাই। পরদিন প্রাতে গ্রামবাসীরা জমিদার বাড়ী আসিয়া এই শোচনীয় দৃশ্য দেখিয়া আশ্চর্যান্বিত হইল।

থানায় সংবাদ গেল। দারোগা ও পুলিশের সুপারিন্‌টেন্‌ডেন্ট সহ জেলার ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব চলিয়া আসিলেন তদন্তে।

চারিদিকে তত্ত্বতালাস করিতে করিতে দারোগা লক্ষ্য করিলেন যে, রামনারায়ণ বাবুর মাথার কাছে একটি কাগজের টুকরো পড়িয়া আছে। তাহাতে লেখা ছিল—যে গরীব ব্রাহ্মণকে আপনি একটি টাকা দান করিয়াছিলেন, সে সেই টাকাটা আপনাকে ফিরাইয়া দিয়া গেল। আপনার বাড়িঘরে যা পাইয়াছি সবই নিলাম। আপনার খাবার বাসনপত্র মাত্র রাখিয়া চলিলাম।

* এই ডাকাতি সম্বন্ধে ডাকাতি দমনের কমিশনার লিখিয়াছেন—...One of the most serious robberies committed by him, was at the village Julsora, in the Hoogly District, about fifty miles from Calcutta.



সাপুড়ে ও ডাকাতদল

কলিকাতার বিখ্যাত লাহাবাবুদের জমিদারী ফরিদপুর ও বরিশাল জেলার সীমানায় মাথাভাঙ্গা গ্রাম। সেই পল্লীগ্রামের চারিদিকের নদীর চরাভূমি, জমিজমা সবই তাঁহাদের জমিদারীর অন্তর্গত। সেখানকার নায়েব তাঁহাদেরই একজন পরিচিত ভদ্রলোক। এই ভদ্রলোকের নাম অমৃতলাল চক্রবর্তী। অনেক দিন এই স্টেটে কাজ করিতেছেন। ভদ্রলোক গৌরবর্ণ, বলিষ্ঠকায়, বুদ্ধিমান ; বয়স তাঁহার চল্লিশের নিচে। পূজার ছুটিতে হুগলী জেলার মল্লিকপুর গ্রামে নিজ বাড়িতে আসিয়াছিলেন। এইবার ছুটিশেষে কার্যস্থলে ফিরিয়া যাইতে উদ্যোগী হইলেন। সঙ্গে তাঁহার স্ত্রী ও চার-পাঁচ বছরের পুত্র।

অমৃতবাবুর কার্যস্থল দূর পথ, নৌকায় যাইতে হয়। সেখানে জিনিসপত্র তেমন মিলে না। কাজেই পল্লীগ্রামে সচরাচর মিলে না এমন দুই একটি শৌখিন জিনিস সংগ্রহ করিয়া সঙ্গে লইয়াছিলেন। এজন্য তাঁহাকে কলিকাতা যাইতে হইয়াছিল। কলিকাতায় গিয়া মনিবের সঙ্গে দেখা করিয়া এবং আবশ্যকীয় জিনিসপত্রাদি লইয়া রওনা হইবার দিন স্থির করিলেন। হুগলী হইতে নৌকা ঠিক করিলেন এবং নিজ বাসভবন মল্লিকপুরের ঘাটে আসিয়া নিশ্চিন্ত হইলেন। পরদিন মধ্যাহ্নে আহার করিয়া রওনা হইবেন—এইরূপ স্থির হইল।

নৌকাখানি বেশ বড়। তাহাতে তিনজন দাঁড়ী ও একজন মাঝি। যথাসময়ে একজন ভৃত্য ও স্ত্রীপুত্রসহ অমৃতবাবু নৌকায় উঠিলেন। দাঁড়ী-মাঝিরা গঙ্গায় পড়িয়াই 'দরিয়ার পাঁচপীর বদর বদর' বলিয়া নৌকা ছাড়িয়া দিল। পানসী নৌকাখানি দেখিতে দেখিতে শহরের সীমানা ছাড়িয়া গেল। নৌকা ধীরে ধীরে চলিতে লাগিল। পথ-ঘাট অমৃতবাবুর জানা। তিনি শুইয়া শুইয়া নিশ্চিন্ত মনে নদীর

শোভা দেখিতেছিলেন। ছেলেটি মায়ের বুকে পরম নিশ্চিন্ত মনে ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল। খানিক পরে ঠাণ্ডা বাতাসে অমৃতবাবুও ঘুমাইয়া পড়িলেন।

সন্ধ্যার আগে হঠাৎ তাঁহার ঘুম ভাঙ্গিল। ঘুম ভাঙ্গিলে তিনি দেখিলেন মাঝিরা একটি খালের ভিতর নৌকা লইয়া আসিয়াছে। এ-পথ ত মাথাভাঙ্গা বন্দরে যাইবার পথ নয়। তিনি মাঝিকে জিজ্ঞাসা করিলেন—এ কোথায় এলে, কোন্ পথ দিয়ে চলেছ? এ পথে ত আমি কোনদিন যাই নি।

অমৃতবাবুর বিশ্বাসী ভৃত্য রামহরি কৈবর্ত কহিল—হাঁ কর্তা, এ আমরা কোন্ পথে যাচ্ছি? চারদিক বন-বাদাড়, বড় বড় গাছ, বাঁশবন। এ যে একেবারে চারদিক থেকে অন্ধকার এসে যেন খেয়ে ফেলতে চাইছে। এ কোথায় যাচ্ছি?

মাঝি কোন উত্তর দিল না।

এইবার অমৃতবাবু একটু ভয় পাইলেন, মাঝিকে বলিলেন—আমরা ত কোনদিন এ-পথে যাই নি। তোমরা কি পথ ভুলেছ?

মাঝি বিরক্ত হইয়া কহিল—কি সব মিছিমিছি কথা বলছেন বাবু! সব মাঝিই কি সব পথ জানে? এই খালের পথ সোজা পথ। এ খাল দিয়ে গেলে একদিন আগে মাথাভাঙ্গা পৌঁছে যাব।

নিশ্চিন্ত হইলেন অমৃতবাবু। মনে করিলেন, হইতেও পারে—জানিনা ত। কিন্তু রামহরি কেবলই ব্যস্ত ভাব দেখাইতে লাগিল—কেমন যেন উস্‌খুস্ করিতে লাগিল।

সন্ধ্যা হইয়া আসিল। নৌকা ধীরে ধীরে চলিতে লাগিল। আকাশে তারা ফুটিয়া উঠিল। এইবার খালের দুই পাশে দেখা যাইতে লাগিল মাঠ। কৃষকেরা গরুর পাল লইয়া বাড়ী ফিরিতেছে। মাঠের দূর প্রান্তের দুই-একটি গ্রাম হইতে দেখা যাইতেছিল প্রদীপের আলো। এমন সময় মাঝিরা খালের এক কিনারায় নৌকা ভিড়াইয়া নোঙ্গর করিল।

অমৃতবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন—এ কোন্ গ্রাম? এ খালের নামও ত শুনি নি? আর এখানেই বা নোঙ্গর করলে কেন?

দাঁড়ী-মাঝিদের একজন বিরক্ত হইয়া বলিল—কর্তা কি যে বলেন! সন্ধ্যা হয়ে এসেছে। গ্রাম থেকে কিছু চাল-ডাল কিনে নিয়ে আসছি!

এই বলিয়া লোকটি চলিয়া গেল। প্রথম দাঁড়ী চলিয়া যাইবার পর দ্বিতীয় দাঁড়ীও চলিয়া গেল। তারপর বাকী দাঁড়ী ও মাঝি একে একে কহিল—তাই ত কেন এল না ওরা, দেখে আসতে হয়। জায়গাটা ত ভাল নয়, দস্যু-ডাকাত আর বাঘের ভয়ও বেশ আছে।

এমনি সব কথা বলিয়া তাহারাও একে একে নৌকা ছাড়িয়া চলিয়া গেল।

অমৃতবাবু লণ্ঠন জ্বালাইয়া নৌকার ভিতর বসিয়া রহিলেন। তাঁহার স্ত্রী রান্নাবান্নার আয়োজন করিতে লাগিলেন। কৃষ্ণপক্ষের রাত্রি। অনেক রাত্রিতে চাঁদ উঠিবে।

অমৃতবাবু এইবার চিন্তিত হইলেন—কি ব্যাপার! তিনি ধীরে ধীরে খালের পাড়ে উঠিলেন। দেখা গেল দিগন্তবিস্তৃত তেপান্তরের মাঠ—সে মাঠের যেন আব শেষ নাই। লোকালয়ের কোন চিহ্ন নাই, ধূ-ধূ করে মাঠ যেন এক অন্ধকারের অজানা রাজ্যে তাঁহারা পৌঁছিয়াছেন দেখিয়া তাঁহার মনে আসিল নানা ভাবনা ও দুশ্চিন্তা। মাঝিরা গেল কোথায়? কে ইহারা? শিশুপুত্র ও স্ত্রী লইয়া এমন অবস্থায় ত তিনি কোনবার পড়েন নাই।

ক্রমে রাত্রি অনেক বাড়িয়া গেল। জঙ্গলের মধ্য হইতে নানা প্রকার চেঁচামেচির শব্দ শোনা গেল। অমৃতবাবু নৌকায় আসিয়া বসিলেন এবং ছেলেটিকে কোলে লইয়া আদর করিতে লাগিলেন।

রামহরি সর্দার বলিল—বাবুমশাই, ব্যাপারটা ভাল দেখছি না। এ পথটা ভাল মনে হয় না। চারিদিকে দস্যু-ডাকাত-ঠেঙ্গাড়ের ভয়। মাঝি বেটারা যে কোথাকার লোক তাও জানি না।

এইসব কথা শুনিয়া অমৃতবাবুর স্ত্রীও ভীত হইলেন এবং স্বামীকে জিজ্ঞাসা করিলেন—কি হয়েছে বল?

অমৃতবাবু বলিলেন—কোন ভয় নেই। এই মাঝিদের কথাই বলছিলাম। এখনও ওরা ফিরে এল না কেন?

এ-কথায় তাঁহার স্ত্রী প্রবোধ মানিলেন না।

এমন সময় একজন দীর্ঘকায় লোক আসিয়া নৌকার পাশে দাঁড়াইল। মাথায় বড় বড় ঝাঁকড়া চুল, কালো কুৎসিত চেহারা, মলিন কাপড় পরা হাঁটু পর্যন্ত। হাতে বালা, গলায় স্ফটিকের মালা, কাঁধে একটা বাঁশের দুই পাশে বড় বড় দুইটি ঝাঁপি, হাতে একটা অদ্ভুত ধরনের বাঁশী। লোকটাকে এরূপ পরিবেশে সহসা দেখিতে পাইয়া অমৃতবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন—তুই কে রে ?

লোকটি কহিল—আজ্ঞে কর্তা, আমি সাপুড়ে। সাপ খেলাতে গিয়েছিলাম দূর গাঁয়ে। ফিরতে রাত হয়ে গেল। এখন কোন নৌকো মিলবে না। আমাদের সঙ্গের নৌকো অন্য দিকে গেছে। দিনের বেলায় নৌকো আসবে কর্তামশাই। আমি এই নৌকোর সামনের দিকে পাটাতনটায় সাপের ঝাঁপি নিয়ে শুয়ে থাকব···

ঃ তোমার ঝাঁপি থেকে সাপ বেরিয়ে যদি বিপদ ঘটায়—

ঃ সে ভয় করবেন না মশায়, বরং আমাকে একটু ঠাঁই দিলে—আমি হয়ত আপনাদের কাজেই লাগব। আপনারা এখানে এলেন কেমন করে ?

তখন অমৃতবাবু তাহাকে সব কথা জানাইয়া বলিলেন, আচ্ছা এস ! তোমার নাম কি ভাই ?

লোকটা উত্তর করিল—আমার নাম বৈকুণ্ঠ বেদে।

বৈকুণ্ঠ এবার নৌকায় আসিয়া বসিল সামনের পাটাতনের উপর। সাপের ঝাঁপি দুইটি তাহার পাশে রাখিয়া চুপ করিয়া বসিল এবং এক ছিলিম তামাক টানিয়া একটু নিশ্চিন্ত হইয়া কহিল—বাবু, এ বড় ভীষণ ঠাঁই ! কেন যে এখানে এলেন জানি না। এই মাঠের পর দুটি বড় গাঁ আছে, সেখানে যারা বাস করে তারা সকলেই ডাকাত। মাঝিরাও ডাকাত। এইবার তারা এল বলে।

অমৃতবাবু বিচলিত হইয়া পড়িলেন ; কহিলেন—ভাই, তুমি আমাদের বাঁচাও।

বেদে বলিল—ডাকাত মাঝিরা আমাদের একজনকেও জীবিত রাখবে না। প্রাণে মেরে সব লুটপাট করে নিয়ে যাবে। তারপর

এই নৌকা আবার যাবে শহরের দিকে। আবার যাত্রী নিয়ে এসে এখানে শেষ করবে।

ঃ ভাই, তুমি আমাদের এ-বিপদ থেকে উদ্ধার কর।

ঃ দেখি কি করা যায়। বড্ড ক্ষিদে পেয়েছে। খাবার জোগাড় দেখি।

অমৃতবাবু কহিলেন—ভাই, আমাদের রান্না চড়েছে। রান্নাবান্না হলেই আমরা একসঙ্গে খাব।

ঃ বাবু কি ব্রাহ্মণ ?

ঃ হাঁ ভাই।

ঃ দেবতা, আপনি ভয় করবেন না, আমি এ-অঞ্চলে প্রায়ই আসি। এদের স্বভাব জানি। আপনার মাঝিরা আসবে রাত দুপুরে। ভাববে আপনারা খেয়ে-দেয়ে ঘুমিয়ে পড়েছেন। তখনই সাবাড় করে বেগে নৌকো চালিয়ে, আপনাদের লাশ নদীর জলে ফেলে দিয়ে আবার শহরে যাবে।

ক্রমে রাত্রি গভীর হইল। সকলের খাওয়া-দাওয়া শেষ হইয়াছে। কিন্তু কাহারও চোখে ঘুম নাই।

মাঝিদের কাহারও দেখা নাই, তাহারা গেল কোথায় !

এমন সময় একটা লোক আসিল লম্বা লাঠি কাঁধে লইয়া। তারপর আসিল একজন, তারপর আরও একজন। এইরূপ বেশে কয়েকজন লোক আসিল খালের পাড়ে। আগত লোকদের মধ্য হইতে একটা লোক লাঠি হাতে নৌকোর উপর ঝাঁপাইয়া পড়িল এবং রামহরিকে সামনে পাইয়া শুধাইল—তুই কে রে এখানে ?

ঃ আমি বাবুর সাথী—বাবুর বন্দরে যাচ্ছি।

ঃ দাঁড়া বেটা, তোকে দিচ্ছি শেষ করে।···এই বলিয়া একসঙ্গে সাত-আটজন লোক লাফাইয়া নৌকার উপর উঠিল।

এমন সময় তড়িংগতিতে বৈকুণ্ঠ বেদে তাহার ঝাঁপি খুলিয়া একটা বড় কালো গোখরো সাপ বাহির করিয়া ছাড়িয়া দিল। সাপটা ফণা তুলিয়া ছোবল দিল প্রথম ডাকাতকে। ওরে বাবা রে,

গেছি রে! বলিয়া লোকটা নৌকা থেকে পড়িয়া গেল খালের জলে।

এইভাবে বন্ধনমুক্ত তিন-চারটি সাপের আক্রমণে ভয় পাইয়া কেহ জলে, কেহ নদীর পারে পড়িল হুটোপুটি করিয়া। বৈকুণ্ঠ এইবার বড় গোখরো সাপটাকে ছাড়িয়া দিল। সে ফোঁস-ফোঁস্ করিয়া এমনভাবে পাড়ে গিয়া ডাকাতের দলকে আক্রমণ করিল যে, তাহারা পলাইবার পথ পাইল না।

বৈকুণ্ঠ বিড় বিড় করিয়া কি মন্ত্র পড়িল কে জানে? কি কৌশলে, কি ভাবে যে বৈকুণ্ঠ সাপদের লেলাইয়া ডাকাতদের তাড়াইয়া দিল, তাহা আশ্চর্য বলিতে হইবে।

ক্রমে জানা গেল ঐ ডাকাতদলের মধ্যে মাঝিরাও আছে। অমৃতবাবু গম্ভীরকণ্ঠে তাহাদের বলিলেন—খবরদার! এক্ষুণি নৌকায় উঠে—চল নৌকা নিয়ে গঙ্গার দিকে।

মাঝিরা বেগতিক দেখিয়া একটি কথাও না বলিয়া নৌকা চালাইতে চালাইতে বলিল—বাবু, আপনার পায়ে পড়ে বলি, আমাদের থানায় ধরিয়ে দেবেন না।

নৌকা নদীর মুখের কাছে আসিলে অমৃতবাবু দেখিলেন—জল-দারোগার একখানি নৌকা ঐ দিকেই আসিতেছে। বৈকুণ্ঠ বেদে চিৎকার করিয়া সেই নৌকা থামাইল। নৌকা থামিলে বৈকুণ্ঠ একে একে সব কথা দারোগাকে বলিল।

পুলিশের দল দাঁড়ী-মাঝিদিগকে গ্রেপ্তার করিল।

ডাকাত মাঝিরা যে এত সহজে ধরা পড়িবে অমৃতবাবু আশা করেন নাই।

মাঝিদের সাহায্যে অন্যান্য ডাকাতেরা ধরা পড়িয়াছিল এবং তাহাদের সাজা হইয়াছিল। বৈকুণ্ঠ সাপুড়ে সরকারের নিকট হইতে উপযুক্ত পুরস্কার পাইয়াছিল।

●



ডাকাত রামার ভদ্রকালী

এক

রামা শ্যামা—দুই ভাই।

তাহারা বিখ্যাত ডাকাত। তাহাদের ভয়ে ফরিদপুর জেলার লোকেরা প্রাণভয়ে কাঁপে। পদ্মার এক বাঁকে তাহাদের বাড়ি। বেশ বড় বাড়ি। বড় বড় চালা ঘর—আটচালা, চৌচালা, দোচালা। প্রচুর গরু-বাছুর আছে। চরের উর্বর মাঠে তাহাদের লোকজনেরা চাষবাস করে, সেটা শুধু লোক দেখান মাত্র। রাত্রিতে দলের লোকেরা আসিয়া বৈঠক করে, তারপর ছিপ নৌকা ছোটে দিকে দিকে ডাকাতি করিতে।

রামা শ্যামা জাতিতে বাগ্দী। এমন ভীষণ চেহারা বড় দেখা যায় না। যমজ দুই ভাই। বলিষ্ঠ চেহারা ' লম্বা চওড়া জোয়ান। সেকালের ইতর-ভদ্র সকলেই রাখিত লম্বা বাবরি চুল। ইহাদেরও ছিল তাই। গলায় শঙ্খের মালা, হাতে বাজু, বালা—সোনার তৈরী। তাহাদের তাঁবে ছিল শ' দুই লাঠিয়াল ও তলোয়ারধারী, বল্লমধারী ডাকাত। জলপথে ও স্থলপথে দুইদিকেই তাহারা ডাকাতি করিত। জেলার হাকিম, পুলিশ দারোগা তাহাদের ধরিতে পারিত না। কোম্পানীর আমল। কালেক্টর সাহেব কলিকাতায় পাঠাইতেন রিপোর্ট—সাহায্য চাহিতেন লোকজন, গোয়েন্দা ও জলপথে স্থলপথে সাহসী সেনার। তবু তাহাদের দমন করা সম্ভব ছিল না।

রামা শ্যামাকে ধরা সহজ ছিল না, কেননা সেকালে কয়েক ঘর ডাকাত জমিদার বাস করিতেন পদ্মার পাড়ে। বিরাট ছিল তাঁহাদের বাড়ি। তাহাতে ছিল দালানকোঠা, অতিথিশালা, কাছারি, বরকন্দাজ, দারোয়ান। এমন দুর্দান্ত দস্যু জমিদার অনেক ছিলেন

তাঁহারা দল বাঁধিয়া যোগ দিতেন রামা শ্যামার সঙ্গে ডাকাতি করিতে। ডাকাতদের সঙ্গে মিলিয়া করিতেন দশমহাবিদ্যার পূজা। সে পূজায় দিতে হইবে নরবলি। জমিদার বংশের একজন স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন মা কালী তাঁহাকে দশমহাবিদ্যা মূর্তি নির্মাণ ও প্রতিষ্ঠা করিয়া একটি নরবলি দিতে আদেশ করিয়াছেন।

প্রচার হইল স্বপ্নকথা। গ্রামে গ্রামে সকলে সতর্ক রহিল নিজ নিজ ছেলেদের লইয়া। কেহ ঘর হইতে ছেলেদের বাহির হইতে দিত না। ঐ ছেলে নিতে এল রে!—শোনা যাইত জননীদের মুখে ঘরে ঘরে। দারোগা পুলিশ সতর্ক নজর রাখিতে লাগিলেন চারিদিকে। কিন্তু নির্ভীক চৌধুরী জমিদারেরা রামা ও শ্যামার সাহায্যে একটি শিশুকে চুরি করিয়া আনিয়া গভীর নিশীথে দশমহাবিদ্যার কাছে বলি দিলেন! তান্ত্রিক সাধক শ্যামানন্দ করিয়াছিলেন দশমহাবিদ্যার পূজা।

সেকালে ধর্মের নামে ছিল এমনি নৃশংসতা! এখনও কি নাই?

এই চৌধুরী জমিদারেরা ছিলেন রামা শ্যামার মত দুর্দান্ত দস্যুদের সঙ্গী, কাজেই ইহারা সর্বদা নির্ভয়ে ডাকাতি করিয়া ফিরিত। কে তাহাদের ধরিবে!

দুই

সিপাহী-বিদ্রোহের সূত্রপাত হইয়াছে ঢাকা শহরে ও পূর্ববঙ্গের নানা শহরে। লোক বিপন্ন। কলিকাতা হইতে কোম্পানীর একদল সিপাহী দুইজন ইংরেজ কাপ্তেনের সঙ্গে গিয়াছে ঢাকা শহরের দিকে। দেশী সিপাহী ছিল বেশী। তাহারা নৌকা ভিড়াইয়া রান্নাবান্না করিতেছিল। সাহেব কাপ্তেনরা বোটে খানা খাইতেছিলেন। নৌকা ছাড়িবার সময় হইতেছিল। কাপ্তেন বাঁশী বাজাইতে যাইবেন, এমন সময় ঘটিল অঘটন।

সিপাহীরা আহারাদির জন্য কলাপাতার সন্ধানে চৌধুরীদের বাগানে প্রবেশ করে। চৌধুরীদের কর্তা ও তাঁহার লোকেরা তাহাদের বলে—খবরদার, এক পা এগুবে না। কাটিতে পারবে না কলাপাতা।

সিপাহীদের মেজাজ ত স্বাভাবিক ভাবেই ছিল চড়া। উদ্ধত সিপাহীরা তাহাদের কথা শুনিল না—নিঃশঙ্কচিত্তে কলাপাতা কাটিতে লাগিল।

সেদিন রামা ও শ্যামা সদলবলে সেখানে উপস্থিত ছিল। কথা ছিল—নদীর পরপারের এক জমিদার বাড়ি লুঠ করবে সেদিন। কিন্তু আকস্মিক ঘটিল এই বিপদ। চৌধুরীদের কর্তা হুকুম দিলেন তাঁহার লোকজনদের—ওদের মেরে তাড়িয়ে দাও। সিপাহীদের নৌকা ডুবিয়ে দাও পদ্মার জলে। টেনে তোল পাড়ে কাপ্তেন সাহেবের বোট।

আরম্ভ লইল ভীষণ হাঙ্গামা। লাঠালাঠি, বল্লম-বর্শা ছোড়াছুড়ি, একটা ছোটখাঠ লড়াই হইল। সিপাহীদের নৌকা ডুবাইয়া, তাহাদের বন্দুক কাড়িয়া হাত-পা বাঁধিয়া—ফেলিয়া রাখিল একটা অন্দরের বড় তুইটা ঘরের ভিতর!

সাহেবেরা অবশ্য ঢাকা চলিয়া যাইতে পারিয়াছিলেন। রামা শ্যামার দল এই লড়াইয়ে খুবই বীরত্ব দেখাইয়াছিল।

এক সপ্তাহ পরের কথা। ঢাকা হইতে আসিল বহু সৈন্য-সামন্ত; চৌধুরীদের বাড়ি ঘেরাও করিয়া ফেলিল।

কোম্পানীর কাছে যখন এ-সংবাদ পৌঁছিল তখন হুকুম আসিল অতি ভীষণ—চৌধুরীদের বাড়ীতে, তেল ঢেলে আগুন দিয়ে জ্বালিয়ে ভস্ম করে ফেল!

আদেশ পালিত হইল। নিরুপায় চৌধুরীরা সর্বস্ব হারাইয়া এক দূর নির্জন পল্লীতে গিয়া আশ্রয় লইলেন। তাঁহাদের বংশধরেরা অতি হীন অবস্থায় এখনও বাঁচিয়া আছে।

রামা শ্যামার খবর শোন এইবার।

তিন

দাঙ্গা-হাঙ্গামার শেষে রামা শ্যামা মনে করিল, ফল ভাল হইবে না। ধরা পড়িলে, ফাঁসী হইবে নিশ্চিত।

তাহারা দলবল সহ পলাইল। পলাইবার পথে পদ্মার একটা শাখানদী বাহিয়া যাইবার সময় দেখিতে পাইল একখানি বড় বাড়ি।

নদী সেখানে শীর্ণ হইয়া বাঁকিয়া চলিয়াছে। তাহারা নানা ভাগে বিভক্ত হইয়া নদীরপাড়ের ঝোপঝাড়েরআড়ালে নৌকা নিয়া বাঁধিল। তখন সন্ধ্যা হইয়াছিল। চারদিকে অন্ধকার ঘনাইয়া আসিয়াছিল।

রামা বলিল—শ্যামা, বাড়িটা ঘুরে ফিরে দেখে আয়। বেশ বড় লোকের বাড়ি। এতদিন ত কোন মালই হাতে এল না!

দাদার যোগ্য ভাই শ্যামা। চারিদিক ঘুরিয়া আসিয়া বলিল—দাদা! ধনী ব্যবসায়ীর বাড়ি। বেশ মাল জুটবে। তৈরি হও, রাত দুপুরে আমরা লুঠ করব।

সে ব্যবস্থাই হইল।

দুপুর রাত্রে ঐ বাড়ি আক্রমণ করিতে চলিল রামা শ্যামা। কিন্তু—এ কি! বাড়ির সকলেই যে জাগিয়া আছে! ঘরে ঘরে আলো জ্বলিতেছে! কিছুক্ষণ আগে যে বাড়ি ছিল নীরব নিস্তব্ধ অন্ধকার, সহসা তাহাতে এত আলো আসিল কোথা হইতে? এত লোকজনই বা আসিল কোথা হইতে?

রামা ও শ্যামা সেই লোকজন ও আলো গ্রাহ্য না করিয়া দলে দলে নানা দিক দিয়া 'হা-রে-রে-রে' করিতে করিতে মশাল জ্বালিয়া উজ্জ্বল আলো উজ্জ্বলতর করিয়া ঘিরিল সেই বাড়ি।

সিংহ-দরজার মধ্য দিয়া যে-সময় প্রবেশ করিতে যাইবে তখন দেখিতে পাইল এক ভয়াবহ দৃশ্য। চমকিয়া উঠিল রামা শ্যামা। তাহাদের হাত কাঁপিল পা কাঁপিল।

ভীষণদর্শন এক তান্ত্রিক সাধক। হাতে তাঁহার—করালবদনা, ভয়ংকরাকৃতি, আলুলায়িত-কেশা এক চতুর্ভুজা দক্ষিণা-কালীমূর্তি! দেবীর গলায় মুণ্ডমালা, বামভাগের অধোহস্তে সদ্যছিন্ন নরমুণ্ড ও ঊর্ধ্বহস্তে খড়্গ, দক্ষিণ ভাগের ঊর্ধ্বহস্তে অভয় ও অধোহস্তে বরসূচক মুদ্রা রহিয়াছে!

সর্দারের হুকুম নাই। কাজেই ডাকাতের দল নীরবে দাঁড়াইয়া আছে।

এ কি! এ কি! মা যে হাস্যমুখী! দুই ওষ্ঠপ্রান্ত হইতে ঝরিয়া পড়িতেছে রক্তধারা! শিহরিয়া উঠিল রামা শ্যামা।

মূর্তিহস্তে দাঁড়াইয়া আছেন ভীষণদর্শন তান্ত্রিক—দীর্ঘ দেহ, দীর্ঘ কেশ, রক্তচন্দনচর্চিত ললাট। গলায় দীর্ঘ-বিলম্বিত স্বর্ণসূত্রে গ্রথিত রুদ্রাক্ষমালা। বাহুতে—করপ্রকোষ্ঠে রুদ্রাক্ষমালা—চোখ দুইটি জ্বলিতেছে অগ্নি-গোলকের মত! সাধক হাসিতে লাগিলেন—হা—হা—অট্টহাসি! গভীর রাত্রিতে কোথায় ডুবিয়া গেল ডাকাতদের 'হা-রে-রে-রে' শব্দ!

তান্ত্রিক সাধকের অট্টহাসি—দিকে দিকে বনে বনে ধ্বনিত হইয়া উঠিতেছিল ভীম ভয়ংকর ভাবে—হা-হা-হা!

রামা একটু জ্ঞান লাভ করিয়া ক্ষীণকণ্ঠে বলিল—ঠাকুর! আপনি কে? সঙ্গে সঙ্গে সাধকের পায়ে লুটাইয়া পড়িল দুই ভাই।

ঃ আমি—কে আমি? আমাকে জানিস্ না? আমার নাম কামদেব তার্কিক—তন্ত্রচূড়ামণি।

ঃ আপনি! আপনি!—কথা বাহির হইতেছিল না তাহাদের কণ্ঠ হইতে।

ঃ হাঁ আমি! এ আমার শিষ্যবাড়ী। আজ এই অমাবস্যার দিনে আমার মাকে নিয়ে শ্মশানে পূজায় বসেছিলাম। আমার ভক্ত ও শিষ্য—কালীচরণ, কেঁদে গিয়ে বললে—বাবা, আমার যে বড় বিপদ!

বললাম, আমি থাকতে বিপদ! দেখি, রামা শ্যামা কত বড় ডাকাত যে, আমার আশ্রিত মায়ের নিরীহ ছেলের ওপর অত্যাচার করে! করবি ডাকাতি? এই দেখ মা হাসছেন—ঝরে পড়ছে রক্তধারা দুই ঠোঁট বেয়ে!

রামা ও শ্যামা কামদেবের পায়ে লুটাইয়া পড়িয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল—ঠাকুর পদ্মাপারে একটা হাঙ্গামা করে এসেছি, এখানে দিলেন বাধা। কি করি বলুন তো ঠাকুরমশাই?

ঃ তোদের হাঙ্গামায় বিপদ হবে না।

ঃ তা ত হলো! তবে আমরা কি খাব? কেমন করে বাঁচব? ডাকাতি ছাড়লে কে দেবে আমাদের খেতে?

মহাপুরুষ কামদেব বলিলেন—ভয় নেই, এই মূকালীর্তি দিচ্ছি।

এই মাকে এখানে প্রতিষ্ঠা করে তাঁকে নির্ভর করে বসে থাক। মা-ই সমস্ত দেবেন।

এই বলিয়া মায়ের পূজার মন্ত্র দিলেন রামা শ্যামাকে—দীক্ষালাভ হইল তাহাদের।

দিন যায়, মাস যায়, অনাহারে অনিদ্রায় রামা শ্যামার দিন কাটে। তন্ময় হইয়া মা মা বলিয়া ডাকে, তবু মা দেখা দিলেন না! তখন দুই ভাই শক্তিসাধক কামদেবের নিকট গিয়া কাঁদিয়া বলিল—ঠাকুর, মা ত কথাও বলেন না, খাবারও দেন না।

কামদেব বলিলেন—মা যদি কথা না বলেন, তবে মুগুর পেটা করিস্, পেটানোর চোটে আপনি কথা বলবেন।

রামা শ্যামা দুই ভাই আবার আসিয়া বসিল। আবার একমাস ডাকাডাকি করিল।

দেবীর কৃপায় শ্যামার তত্ত্বজ্ঞান জন্মিল।—কিন্তু রামা?—রামার কি হইল?

রামা একদিন মাকে স্পষ্টবাক্যে বলিল—দেখ্ মা, ভালমানুষের মত কথা বলিস্ ত বল, না হলে এই মুগুরে তোর মাথা চূর্ণ করব।—এই কথা বলিয়া যেমন সে মুগুর তুলিয়াছে, মা অমনি পশ্চাৎভাগ হইতে মুগুরের সহিত তাহার হাত ধরিয়া তাহাকে সান্ত্বনা দিয়া অন্তর্হিতা হইলেন।

সেদিন হইতে তাহাদের দৈন্য ঘুচিয়া গেল। নিত্যপূজা ও ভোগ দিতে প্রতিদিন শত শত লোক আসিতে লাগিল। মায়ের কৃপায় সব অভাব ঘুচিল।

ফরিদপুরের কয়ড়া গ্রামে—ডাকাত রামার ভদ্রকালী আজিও ভক্তের পূজা পাইয়া আসিতেছেন।



ফকির রামদুলাল ও ডাকাতদল

এক

সেকালের রাস্তাঘাটের সঙ্গে একালের রাস্তাঘাটের তুলনাই হয় না। তখন কলিকাতার আশে-পাশের গ্রাম, বন্দর ও হাটবাট ছিল বনজঙ্গলে ভরা। দিনে রাতে সকল সময়েই লোকে পথ চলিত ভয়ে ভয়ে—কখন দস্যু-ডাকাতের হাতে পড়ে। এজন্য অনেক সময় লোকে দল বাঁধিয়া চলিত।

এখানে তোমাদের কাছে বলিতেছি একজন বুদ্ধিমান ব্যক্তির কথা তাঁহার নাম ছিল রামদুলাল সরকার। রামদুলাল ছিলেন ভারি সাধু প্রকৃতির লোক। কোন মানুষই ত একদিনে বড় লোক হয় না। রামলালও ছেলেবেলায় ছিলেন অত্যন্ত গরীব, এমন কি দুইবেলা ভাল করিয়া আহারও জুটিত না। অতিকষ্টে দিন চলিত—কোন কোন দিন না খাইয়াও থাকিতে হইত। অবশেষে রামদুলাল পাইলেন এক বিল-সরকারের কাজ কলিকাতার বিখ্যাত ধনী ব্যবসায়ী বাগবাজারের মদনমোহন দত্তের বাড়িতে। মদনমোহনবাবু অত্যন্ত চতুর ও কৌশলী লোক ছিলেন। তাঁহার কাছে রামদুলাল টাকাকড়ি আদায়েব ভার লইলেন। তাঁহার কাজ ছিল বিভিন্ন বন্দরে গিয়া মহাজনদের কাছ হইতে টাকা আদায় করিয়া আনা। রামদুলাল একাজ এমন নিষ্ঠার সহিত করিতেন আর এমনভাবে টাকাকড়ি বুঝাইয়া দিতেন যে, সামান্য ভুলচুকও থাকিত না।

একদিন দুপুরবেলা মদনমোহন ডাকিয়া বলিলেন—রামদুলাল, তোমাকে আজ দমদমের কাছারিতে যেতে হবে। নায়েব জানিয়েছেন

যে, তহবিলে অনেক টাকা জমা আছে। চারদিকে ঠগী, ঠেঙ্গাড়ে, লেঠেল প্রভৃতি নানা রকমের ডাকাতের ভয়, এজন্য সেই টাকাগুলো কলকাতায় পাঠিয়ে দিতে চান। তুমি এখনি চলে যাও। দমদম ত আর বেশী দূর নয়। ওখান থেকে আড়াই ক্রোশ দূরে হচ্ছে বামুন-ডাঙ্গার কাছারি। পথখরচা নাও পাঁচটি টাকা। পথে যদি গোরুর গাড়ী পাও তবে তাতে করেই যেয়ো।

রামদুলাল রাজী হইলেন এবং কাঁধে একখানি চাদর ফেলিয়া রওয়ানা হইলেন দমদম কাছারির দিকে।

দমদম যাইতে সেকালে খুব সাবধান হইতে হইত। পায়ে চলা পথের দুইদিকে ভীষণ জঙ্গল—বড় বড় বটগাছ, পাকুড়গাছ, বাঁশবন, ঝিল, বিল, খাল আর হোগলা বন। ভাবিতে পারিবে না। সেকালের পথের কথা। রামদুলালকে তাঁহার মনিব পূর্বে ছোটখাট মোকামে বিল আদায় করিতে পাঠাইতেন। সে-সব কাজ ভালভাবে করিতেন বলিয়াই দত্তমহাশয় তাঁহাকে মোটা টাকা আদায় করিবার কাজে নিযুক্ত করিয়াছিলেন।

রামদুলাল যথাসময়ে কাছারিতে গেলেন এবং মনিবের চিঠি দেখাইলেন। সেই কাছারির নায়েব ছিলেন একজন বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ। তিনি রামদুলালের কাছে দত্তমহাশয়ের চিঠি পাইয়া বলিলেন—বাবা, তোমার বয়স দেখছি খুবই কম; সঙ্গে কোন লোকজনও নেই। তুমি এত টাকা নিয়ে কেমন করে কলকাতায় বাবুর বাড়ি যাবে?

রামদুলাল উত্তর দিলেন—কর্তার হুকুম, যেতেই হবে।

নায়েব মহাশয় বলিলেন—তা বাপু, আমি আজ তোমাকে কিছুতেই যেতে দেব না। কাল মধ্যাহ্নে সব বুঝ-প্রবোধ করে পাঠিয়ে দেব। বুড়ো মানুষের কথা শোন।

রামদুলাল রাজী হইলেন এবং রাত্রিটা রহিয়া গেলেন। একটা বিলের পাড়ে ছিল কাছারি-বাড়ি। চারিদিকে বাগ্দী, কাহার, সাঁওতাল প্রভৃতি নীচ জাতির বাস। মুসলমান চাষীর সংখ্যাও খুব বেশী। তবে কাছারিতে পশ্চিমদেশের বরকন্দাজ, লেঠেল সর্দার সব আছে, দিনরাত্র পাহারা দেয়, তাই রক্ষা।

রাত বেশ নিরাপদেই কাটিল। পরদিন হিসাবপত্র বুঝিয়া পাঁচ হাজার টাকার থলি লইয়া রামদুলাল কলিকাতায় রওয়ানা হইলেন সেই বুনো গ্রাম্যপথে। তখন কলিকাতা পর্যন্ত রেলগাড়ী হয় নাই। কাজেই অতি সাহসী লোককেও অতি সন্তর্পণে চলিতে হইত।

রামদুলালের যাবার সময় নায়েব মহাশয় বলিলেন—বাবা, সাবধানে যেয়ো যাতে বেলাবেলি পৌঁছুতে পার সে-চেষ্টা করবে। ব্রাহ্মণকে প্রণাম করিয়া রামদুলাল ধরিলেন কলিকাতার পথ।

দুই

দমদম কলিকাতার কাছে হইলে কি হইবে? আগেই বলিয়াছি যে, তখনকার দিনে কলিকাতার কাছাকাছি হইলেও দমদমের বনে জঙ্গলে সাপ, বাঘ, জন্তু-জানোয়ারের ছিল যেমন ভয়, তেমনি ডাকাতেরা সন্ধ্যায়ই হউক কিংবা রাত্রেই হউক, পথিকের সর্বস্ব লুঠিয়া লইয়া বিলের জলে লাশ ফেলিয়া দিত।

রামদুলাল কাছারি হইতে রওনা হইয়া কলিকাতার পথে চলিয়াছেন। আশে পাশে বসতি নাই। দূরে দূরে দুই-একটি গ্রাম আছে। সেখানে লোকজনের বাস। গ্রামের লোকেরা সকলেই যে ভালমানুষ তাহাও ত কেহ বলিতে পারে না।

পথ চলিতে চলিতে ক্রমে সন্ধ্যা হইয়া আসিল। সেদিন ছিল অমাবস্যা। সন্ধ্যাকালেই পথের ধারের বনজঙ্গল অন্ধকারে ঢাকা পড়িল। রামদুলাল ভীত হইয়া পড়িলেন—কি ভাবে কেমন করিয়া প্রভুর টাকা নিরাপদে পৌঁছাইয়া দিতে পারিবেন!

দূরে একটি গ্রামের ঘর হইতে আলো জ্বলিতেছে দেখিয়া ভাবিলেন, ঐ বাড়িতে গিয়া আশ্রয় লইলে বেশ হয়। আবার তাঁহার মনে হইল, গৃহস্থ নিজেই যদি ডাকাত হয়, তাহা হইলে সব কাড়িয়া লইয়া তাঁহাকে ত মারিয়া ফেলিবে! একদিকে ডাকাতদের ভয়, অন্যদিকে বাঘ-ভালুকের ভয়, কি করা যায়? এমন সময় দেখিলেন, দূরে একদল লোক আসিতেছে। মুহূর্ত মধ্যে তিনি এক আশ্চর্য কাণ্ড করিলেন। পথের ধারের একটি কুঁড়েঘরের পাশে ছিল একটি বড় বটগাছ—শাখা-প্রশাখায় ঢাকা এবং তাহার জট নামিয়াছে অনেক।

তাহারই এক পাশে রামদুলাল গায়ের কাপড়চোপড় খুলিয়া টাকার থলিটির একটি পুঁটলি করিলেন টাকার পুঁটলিটি বটের ঝুরির মধ্যে রাখিয়া দিয়া, সারা গায়ে মাটি মাখিয়া মাথার চুল ঝুটির মত করিয়া পথের ধূলা-কাদা মাখিয়া সাজিলেন এক পাগলা ফকির। তারপর তিনি বটগাছে হেলান দিয়া বসিলেন।

এমন সময় লাঠি ও মশাল হাতে আসিল একদল ডাকাত। নজর পড়িল তাহাদের রামদুলালের ওপর। মশালের আলো ফেলিল তাঁহার মুখের সামনে। অমনি হি-হি-হি করিয়া হাসিয়া উঠিলেন ছদ্মবেশী রামদুলাল। দলের সর্দার বলিল —এ বেটা পাগলা ফকির। চল্ চল্—গাঁয়ের দিকে যাই। ডাকাতেরা রামদুলালকে কিছু না বলিয়া অন্যদিকে চলিয়া গেল।

পরদিন প্রভাতে উষার আলো প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গেই পাখীর ডাক শুনিতে শুনিতে রামদুলাল কলিকাতার দিকে রওয়ানা হইলেন এবং বেলা দ্বিপ্রহরে পৌঁছিলেন দত্ত বাড়িতে। মদনমোহন দত্তের কাছে টাকার থলিটি বুঝাইয়া দিয়া, পথের বিপদের কথা বলিলেন। শুনিয়া বিস্মিত হইলেন দত্ত মহাশয় এবং সম্পূর্ণ বিশ্বাস করিয়া তাঁহার ওপর দিলেন আরও গুরুতর কার্যের ভার।

কেমন করিয়া রামদুলাল একটা ডুবো জাহাজ কিনিয়া তাঁহার মনিবের উদারতার গুণে মহাধনী হইয়াছিলেন, সে গল্পটি তোমরা হয়ত অনেকেই জান। প্রভুর টাকায় ডুবো জাহাজ কিনিয়া চৌদ্দ হাজার টাকার পরিবর্তে এক লক্ষ চৌদ্দ হাজার টাকায় একজন ইংরাজের কাছে তাহা বিক্রয় করিয়া আসিয়া প্রভুকে সব কথা জানাইয়া টাকাগুলি দিয়াছিলেন। তখন মদনমোহন দত্ত সানন্দে বলিয়াছিলেন – রামদুলাল, তোমার সাধুতার পুরস্কার এই এক লক্ষ টাকা। এ-টাকা আমি চাই না, এ টাকা তোমার! তুমি এই টাকা দ্বারা ব্যবসা-বাণিজ্য করে ধনী হও, আমার আশীর্বাদ জেনো!

এই বলিয়া দত্ত মহাশয় রামদুলালের হাতে লক্ষ টাকার থলিটি তুলিয়া দিয়াছিলেন।



দুলাল দাদা

এক

সেকালে উনবিংশ শতাব্দীতে শান্তিপুরে ছিল দস্যু-ডাকাতের বাস। পাড়ায় পাড়ায় বাস করিত দস্যু-ডাকাতেরা। শান্তিপুরের দক্ষিণে গঙ্গানদীর বুকে সব চেয়ে বেশি ডাকাতি হইত।

পূজার সময় নানা দেশের যাত্রীরা নানা দিকে নিজ নিজ বাসস্থানে যাইতেছেন—সঙ্গে স্ত্রী-পুত্র-পরিবার, পূজার কাপড়, টাকাকড়ি, লোকজন। সেকালের নৌকাযাত্রা ছিল বড় আনন্দের, জোয়ারের টানে নৌকা চলিত তর্-তর্ বেগে। মাঝিরা স্রোত ফিরিলে কোন হাটে বা বন্দরে নৌকা ভিড়াইত—বাজার করিত। যাত্রীরা তীরে রান্নাবান্না করিত। আবার নৌকা চলিত নির্দিষ্ট স্থানের উদ্দেশে।

নৌকা-যাত্রীরা ভয়ে ভয়ে পথ চলিত, বিশেষতঃ ডুমুরদহ, গুপ্তি-পাড়া প্রভৃতি গ্রামের পাশ দিয়া যাতায়াতের সময়ে নিরীহ নৌকা-যাত্রীদের বিপদে পড়িতে হইত। পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, শান্তিপুর ছিল অতি ভয়ানক স্থান। কেহ শান্তিপুরের কাছ দিয়া নৌকা লইয়া যাইতে সাহস করিত না—বিশেষতঃ রাত্রিতে। শান্তিপুরের ডাকাতেরা দিন-দুপুরেও ডাকাতি করিত। তখনকার দিনে না ছিল পাহারা, না ছিল চোর-দস্যুদের ধরিবার কঠোর ব্যবস্থা।

শান্তিপুরের ডাকাতদের মধ্যে কুখ্যাত ডাকাত ছিল দেবী ঘোষ, নবীন ঘোষ, গোবিন্দ ঘোষ, ডাকাত কালমেঘা, শিবেশনি। এই ডাকাতেরা সকলেই ছিল শান্তিপুরের অধিবাসী। বাইরের দুই-চারিজন ডাকাতও ইহাদের দলে মিলিয়া মাঝে মাঝে ডাকাতি করিত। তাহাদের মধ্যে একজন ছিল দুলাল সর্দার। ডাকাতদের অনেকেই ছিল গোয়ালা ও জেলে।

ওই সব দলে আবার অনেক বাবুডাকাতও ছিলেন। রাত্রিতে তাঁহারাও দস্যুদের সঙ্গে মিলিত হইয়া ডাকাতি করিতে যাইতেন। সেকালে বড়লোক অনেকেই ছিলেন ডাকাত।

আশানন্দ ঢেঁকি ছিলেন শান্তিপুরের গৌরব—অসাধারণ শক্তিশালী বলিষ্ঠ ব্যক্তি। তাঁহার ভয়ে এসব ডাকাত শান্তিপুর গ্রামে বড় একটা ডাকাতি করিত না। আশেপাশে এমন কোন গ্রাম ছিল না, নদী খাল-বিল ছিল না, যেখানে শান্তিপুরে ডাকাতরা ডাকাতি না করিত।

ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর লোকেরা কিছুতেই ডাকাতদের দমন করিতে পারিতেছিল না। শান্তিপুরের জমিদারেরাও ডাকাত ধবিবার অছিলায় অনেক সময় নিজেরাও ডাকাতি করিতেন। সেকালে অকথ্য অত্যাচার হইত নিরীহ প্রজাদের উপর—যাহারা নীলকুঠির সাহেবদের নিকট হইতে দাদন লইতে চাহিত না, নীল বুনিতে চাহিত না। নীল চাষ করিতে বলিলে তাহারা করিত বিদ্রোহ।

শোন দুই-একটি গল্প। কিরূপ নির্ভীক ও সাহসী ছিল এই ডাকাতদল।

সেকালে শান্তিপুরে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর সূতার গুদাম ছিল। সেই গুদামে সব মাল জমা হইত। কোম্পানীর গোমস্তারা গুদামের কাজকর্ম দেখিতেন এবং সেখানে তূলা, সূতা ইত্যাদি সব মাল জমা করিয়া রাখিতেন। লোকজনও পাহারা থাকিত। শহরের উপর গুদাম।

একদিনের ঘটনা। শান্তিপুরের আড়তে যথারীতি পাহারাওলারা পাহারা দিতেছে। রাত্রি এক প্রহরও হয় নাই, এমন সময় শোনা

গেল হা-রে-র-রে শব্দ। সঙ্গে সঙ্গে ঘোড়সওয়ারদের ঘোড়ার পায়ের ঘটাঘট্ খট্ খট্ শব্দ! কালো-মুখোশপরা, ভীষণাকৃতি প্রায় পঞ্চাশ জন ডাকাত—কাহারও হাতে তলোয়ার, কাহারও হাতে লাঠি, বর্শা ও বন্দুক—আড়তের মধ্যে প্রবেশ করিয়া গুদাম ভাঙ্গিয়া তচ্‌নচ্ করিল। মশালের তীব্র আলোকে চারিদিক দিনের আলোর মত উজ্জ্বল হইয়া উঠিল।

গ্রামের লোকেরা কেহ বাধা দিতে সাহসী হইল না। ডাকাতেরা আড়তের সকলের হাত-পা বাঁধিয়া ফেলিয়া রাখিল। তারপর জোর করিয়া আড়তের গোমস্তা মনোহর ভট্টাচার্য্যকে ধরিয়া লইয়া গেল। ভট্টাচার্য মহাশয় কোম্পানীকে সূতার মাল যোগান দিতেন।

এই ডাকাতির ফলে কোম্পানীর কাজ একেবারে অচল হইয়া পড়িল। লোকে বলিতে লাগিল যে, এই আড়ত লুঠ করিতে প্রায় দুই-তিন শত বরকন্দাজ, ঘোড়সওয়ার আসিয়াছিল! কাজেই গ্রামের লোকেরা প্রাণের ভয়ে কেহই বাধা দিতে আসে নাই। এ যে সাধারণ ডাকাতি নয়, তাহা সকলেই বুঝিতে পারিয়াছিল।

কোম্পানীর গুদাম লুঠ করা ত আর সহজ কথা নয়! অনেকেই মনে করিলেন নীলকুঠির সাহেবের সঙ্গে নীলের চাষ লইয়া—দাদন লইয়া এবং চাষীদের ওপর অত্যাচারের দরুন কোম্পানীর শাসকদের শাসন-ব্যবস্থা নীলকর সাহেবের পক্ষে ক্ষতিজনক হইয়াছিল, তাই কোম্পানীর বিরুদ্ধে কোম্পানীর গুদামে এইরূপ ডাকাতি হইল। বোর্ডের নিকটও এই অত্যাচারের বিরুদ্ধে অভিযোগ করা হইয়াছিল।

১৮৫৪-৫৫ খ্রীষ্টাব্দে কোম্পানীর কর্তৃপক্ষ ডাকাতি দমনের জন্য একটি নূতন বিভাগ খুলিলেন। নাম হইল ডাকাতি দমন বিভাগ (Suppression of Dacoity in Bengal)। এই দস্যু দমন সংক্রান্ত বিভাগের কমিশনার শান্তিপুরের গঙ্গার তীরে তীরে, শহরে ও অন্যান্য স্থানের ডাকাতি দমনের জন্য একজন ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেটকে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। তাঁহার নাম চন্দ্রশেখর রায়। ইনি অত্যন্ত যোগ্য ব্যক্তি ছিলেন। চন্দ্রশেখর বাবু শান্তিপুরের অনেক দস্যুকে গ্রেপ্তার করেন। গঙ্গা নদীতে যাহাতে ডাকাতি না হয়, সেজন্য প্রহরী

নৌকার ব্যবস্থা হইল। তাহারা নদীতে ঘুরিয়া ফিরিয়া পাহারা দিত। স্থলভাগে ঘাঁটিতে ঘাঁটিতে প্রহরী থাকিত এইরূপ প্রহরায় কতকটা উপকার হইয়াছিল।

অনেক কথা বলিলাম। এইবার দুলাল সর্দারের কথা বলি। দুলাল সর্দার ছিল রংপুরের বিখ্যাত ডাকাত। জাতিতে জেলে ছিল বলিয়া জলদস্যুগিরিতে সে ছিল ওস্তাদ। তাহার দলে ছিল তাহার অনেক জাতভাই। ইহারা বাঙলার নানা জায়গায় দ্রুত নৌকা বাহিয়া আসিয়া উত্তরবঙ্গের ও পূর্ববঙ্গের গঙ্গা নদী এবং অন্যান্য নদীতে সর্বত্র যেসব যাত্রীবাহী নৌকা যাইত তাহার সন্ধান লইত, তারপর অতর্কিতে আক্রমণ করিত—একটি প্রাণীর মুখ দিয়াও কোন কথা বাহির হইতে পারিত না। সঙ্গে সঙ্গে সর্বস্ব লুঠিয়া আরোহীদের মারিয়া কাটিয়া জলে ভাসাইয়া দিত।

এই দুলাল সর্দার কাহাকেও ভয় করিত না। সে ছিল দক্ষ লাঠিয়াল—হাড়ে মাংসে গড়া প্রায় ছয় ফুট দীর্ঘ বলিষ্ঠ দেহ। রণ-পা করিয়া দূর গ্রামে দলবল লইয়া ডাকাতি করিয়া সে রাত্রিতেই আবার আড্ডায় ফিরিয়া আসিয়া নিদ্রা যাইত। সকালবেলা সকলে দেখিত সহজ সরল ভাল মানুষ দুলাল তাহার বাবরি চুল দুলাইয়া বৈঠা হাতে সঙ্গীদের সহ চলিয়াছে নদীতে ও খালে বিলে মাছ ধরিতে। কিন্তু এই দুলাল সর্দারের রাত্রির রূপ তোমরা কল্পনাও করিতে পারিবে না। সারা মুখে কালি মাখিয়া, কপালে সিন্দুর লেপিয়া, গায়ে তেলকালি মাখিয়া, বনজঙ্গলের মধ্যে সিদ্ধেশ্বরী কালীর পূজা দিয়া বাহির হইত সে ডাকাতি করিতে—ভূত-প্রেতের মত বিকট নৃত্যভঙ্গীতে। সে সকলের আগে লাঠি ও তলোয়ার হাতে চলিত দল লইয়া, মুখে জয় মা কালী—জয় মা কালী রবে!

দুই

'শান্তিপুর ডুবু-ডুবু নদে ভেসে যায়', একথা ত আমরা সকলেই বলি; কিন্তু এই শান্তিপুরেই ছিল ডাকাতদের প্রধান আড্ডা, তাহা আগেই বলিয়াছি।

অদ্বৈত গোস্বামীর বংশধরেরা শান্তিপুরে বাস করেন। তাঁহার সম্বন্ধে বৈষ্ণব কবিরা বলিয়াছেন ঃ

অদ্বৈত আচার্য্য গোসাঞী সাক্ষাৎ ঈশ্বর।
যাঁহার মহিমা নহে জীবের গোচর ॥

শান্তিপুরের বৈষ্ণব গোস্বামিগণ ইঁহারই বংশধর। পূর্বে ইঁহাদের বাসস্থান ছিল শ্রীহট্টের অন্তর্গত নবগ্রাম নামক গণ্ডগ্রামে। এই বংশের নৃসিংহ মিশ্রই প্রথম শান্তিপুরে বাসস্থান নির্মাণ করেন। তাঁহারই বংশে অদ্বৈতাচার্যের জন্ম। এই বংশের গোস্বামীরা শান্তিপুরে বাস করিতেছেন। অদ্বৈত বংশের দশম পুরুষ হইতেছেন বিখ্যাত ধর্মাচার্য মহাপুরুষ শ্রীশ্রীবিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী।

যে দুলাল সর্দারের কথা বলিতেছি—সেই দুলাল সর্দার ছিল গোস্বামীদেরই প্রজা। বাড়ি ছিল রংপুর জেলায়। বিজয়ের পিতা আনন্দকিশোর গোস্বামী ছিলেন সাধু ও সজ্জন—অতি সরল স্বভাবের লোক। পরের সেবা-যত্ন করিয়াই তাঁহার আনন্দ হইত। এই আনন্দকিশোর গোস্বামীর তৃতীয় পত্নী দেবী স্বর্ণময়ীর গর্ভে ব্রজগোপাল ও বিজয়কৃষ্ণের জন্ম হয়। বিজয়কৃষ্ণের জননী পরম দয়াবতী ছিলেন। ইঁহার নিকট ছোট-বড় বিচার ছিল না। যে আসিত তাহাকেই তিনি প্রীতির চক্ষে দেখিতেন। সেই দস্যু দুলাল যখন কোন কাজে শান্তিপুরে আসিত, তখন প্রতিদিন সকাল-সন্ধ্যায় শ্রীশ্রীশ্যামসুন্দর জীউর মন্দিরের নিকট মাটিতে পড়িয়া সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিত, প্রসাদ পাইত। অদ্ভুত চরিত্র ছিল এই দুলালের।

বালক বিজয়কৃষ্ণকে দুলাল বড়ই ভালবাসিত, আদর করিত। কয়েকবার বিপদ হইতেও তাঁহাকে রক্ষা করিয়াছে। কেহ যদি দেবী স্বর্ণময়ীকে বলিত, একটা শিশুকে ডাকাতের কোলে কেন তুলে দিচ্ছেন?—মাতা স্বর্ণময়ী হাসিয়া বলিতেন—দুলালও ত মানুষ।

ডাকাত দুলালের গতিবিধি ছিল সর্বত্র। নানা দেশে সে ডাকাতি করিয়া ফিরিত। কখনও সে শান্তিপুরে গঙ্গার বুকে ডাকাতি করিত, আবার কখনও করিত উত্তরবঙ্গে। এমনি ছিল দুলাল সর্দারের গতিবিধি। বাল্যকালে রংপুরের বাসায় আসিলে, দুলাল বিজয়কে

সর্বদা কোলে রাখিত। বালক বিজয়ও তাহাকে দাদা বলিয়া ডাকিতেন, যদিও দুলাল ছিল দস্যু-দলপতি। সারা বাঙলাদেশে বিশেষতঃ উত্তরবঙ্গে তাহার নাম না জানিত এমন লোক ছিল না। এইবার বলিতেছি এহেন দুলাল দাদার কীর্তি-কাহিনী!

তিন

বিজয়কৃষ্ণ অল্পবয়সে পিতাকে হারাইয়াছিলেন। সেজন্য সংসারে দেখা দিয়াছিল অভাব-অভিযোগ। আনন্দ কিশোর গোস্বামীর মৃত্যুর পর মাতা স্বর্ণময়ী নিজেই শিষ্যবাড়ী যাইতেন।

একবার স্বর্ণময়ী দেবীর দুই পুত্র ব্রজগোপাল ও বিজয় এবং অন্যান্য কয়েকজন আত্মীয়-স্বজন লইয়া নৌকাতে করিয়া রংপুর জেলার শিষ্যবাড়ী যাইতেছিলেন। সেই সময়ে চারিদিকে দস্যুভীতি—সর্বত্র লুঠ, ডাকাতি রাহাজানি।

রাত্রিকালে নৌকো চলাচল নিরাপদ ছিল না। নদীর মধ্যে একটা চরের কাছে ছিল ঝাউবন, সেই বনের আড়ালে নৌকা বাঁধিয়া রাখিয়াছেন যাত্রীদল। চারদিক নীরব ও নিস্তব্ধ। ঝাউবনে মাঝে মাঝে শিয়াল ডাকিতেছিল হুক্কা-হুয়া রবে।

এমন সময় ঝাউবনেব পাশ দিয়া নদীর ধারে আসিয়া একখানি ছিপ নৌকা ভিড়িল। চুপি চুপি আসিয়া দস্যুরা একজনের পর একজন হাতিয়ার হাতে নৌকার উপর উঠিল। সেই সময়ে ডাকাতেরা চিৎকার করিয়া উঠিল—জয় মা কালী! হা-রে-রে-রে-রে! ধ্বনিত হইয়া উঠিল দিকে দিকে সেই ভীষণ রব।

নৌকারোহীরা সকলে প্রমাদ গণিলেন; ইষ্টনাম জপিতে লাগিলেন। বুঝিলেন আর বাঁচিবার উপায় নাই।

এমন সময় বাহির হইতে ডাকাতদের সর্দার হুকুম করিল—নৌকা লুঠ কর্! সব মেরে ভাসিয়ে দে নদীর জলে!

কী ভীষণ মূর্তি সর্দারের। দীর্ঘাকৃতি—ছয় ফুট লম্বা। মাথায় ঝাঁকড়া চুল—লাল কাপড় দিয়া মাথা বাঁধা। মুখে কালি মাখা। হাতে লম্বা লাঠি। সারা শরীরে তেলকালি। ভীষণ কর্কশ স্বরে

আবার হুকুম হইল সর্দারের—নৌকা লুঠ কর। লোকদের মেরে ভাসিয়ে দে নদীর জলে।

সর্দারের হুকুম শুনিয়া বিজয়ের মনে হইল, এ যে পরিচিত স্বর! বালক বিজয় চমকিয়া উঠিলেন, বলিলেন—কে-ও? ও কে —দুলাল দাদা তুমি?

দস্যুরা চমকিয়া উঠিল। দস্যুসর্দার নৌকার ভিতর হইতে বালক-কণ্ঠে তাহার নাম শুনিয়া বিস্মিত হইল। এ ডাকাত-সর্দার আর কেহ নহে, স্বয়ং বিজয়ের দুলাল দাদা।

দুলাল অমনি নৌকার নিকটে আসিয়া দেখিল ছইয়ের মধ্যে অন্ধকারে কাহারা যেন ভীত-সন্ত্রস্ত ভাবে জড়সড় হইয়া বসিয়া আছেন। দুলাল বিস্মিত ভাবে কম্পিতকণ্ঠে বলিল- কে গো? ও কে? আমার দাদা গোঁসাই! এত রাত্রে এই নদীর ভিতর চরের কাছে কেন নৌকা লাগিয়েছেন? কে কে সঙ্গে আছেন?

বিজয় বলিলেন—মা আছেন দুলালদা! দাদা আছেন, আরও অনেক আছেন।

—উঃ তাই নাকি! আর একটু হলেই ত সর্বনাশ হত। বড় বাঁচা বাঁচলে গোসাই দাদা! দাদা গোঁসাই, শ্যামসুন্দরই তোমাদের বাঁচিয়ে দিলেন।

সেই মুহূর্তে লজ্জায় ও অনুতপ্ত-চিত্তে দুলাল নীরবে দলবল সহ চলিয়া গেল। যাইবার সময় দলের একটি লোককে নৌকায় রাখিয়া, দেবী স্বর্ণময়ীকে সে বলিয়া গেল—মা ঠাকরুণ, কোন ভয় নেই। সঙ্গে লোক দিলাম – নিরাপদে পৌঁছে যাবেন শিষ্যবাড়ী!…ভয় করো না দাদা গোঁসাই!

এই বলিয়া সে নৌকার বাহির হইতে মাতা স্বর্ণময়ী ও বিজয়কৃষ্ণের উদ্দেশে প্রণাম করিয়া প্রস্থান করিল।

ডাকাত ও কুকুর



এক

১৮৪৭ খ্রীষ্টাব্দের কথা। টালিগঞ্জের নালা বা খালের অনেকটা দূরে একটি শ্মশান। শ্মশানে আছে মন্দির—মন্দিরে আছেন ভীষণ-মূর্তি শ্মশানকালী। চারিদিকে গভীর বনভূমি। আশে পাশে লোকালয় নাই। দূরে দেখা যায় বটগাছের ছায়ায় বাঁশবনের আড়ালে দুইএকটি পল্লী। মন্দিরটি অতি প্রাচীন। এই মন্দিরের ইতিহাস কেহ জানে না। শ্মশানকালীর মন্দিরের পিছনে পড়িয়া আছে বহু মড়ার মাথার খুলি আর হাড়গোড়। এখানে মাঝে মাঝে হয় নরবলি।

একদল ডাকাত মহীশূরের এক সুলতান-নন্দিনীর প্রাসাদে ডাকাতি করিবে স্থির করিয়াছে। এখানেও মহীশূরের সুলতানের একটা প্রাসাদ আছে, তাহা হয়ত তোমরা জান। ডাকাতি করিবার পূর্বে ডাকাতেরা করে কালীপূজা। কালীপূজা না করিয়া তাহারা কোথাও ডাকাতি করিতে যায় না। সেইজন্য এক অমাবস্যা রাত্রিতে পঞ্চাশ জন ভীষণাকৃতি ডাকাত শ্মশানকালীর মন্দিরে আসিয়া মিলিত হইয়াছে। শ্মশানকালীর পূজা দিয়া তবে তাহারা যাইবে ডাকাতি করিতে। কি ভীষণমূর্তি শ্মশানকালী রক্তচক্ষু, মুক্তকেশী, স্মিতবক্ত্রা, নানালংকারভূষিতা। ডাকাতদের পুরোহিত ছিল এক ব্রাহ্মণ ডাকাত। তাহার নাম রমাই ঠাকুর—ওরফে রমাই ডাকাত। রমাই মন্ত্র পড়িল—ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ ক্লীঁ কালিকে ক্লীঁ শ্রীঁ হ্রীঁ ঐঁ।

সঙ্গে সঙ্গে ডাকাতেরা জয় মা কালী বলিয়া চিৎকার করিয়া উঠিল। কলসী কলসী মদ পান করিল। সকলে আনন্দে উৎফুল্ল।

ডাকাতদের একটা নিয়ম আছে, কোথাও ডাকাতি করিতে যাইবার পূর্বে একটা শপথ করিতে হয়। এইবার সর্দার ডাকাত

রাধা শিকারী বলিল—ভাই সব, মায়ের আশীর্বাদ নিয়ে আজ আমরা কাজ (কাজ অর্থে ডাকাতি) করতে যাব ; তোমরা রাজী ?

সমস্বরে সেই পঞ্চাশ জন ডাকাতের মুখ দিয়া বাহির হইল—রাজী !

—ভাই সব, হাতিয়ার হাতে নিয়ে বলো—কাকেও ভয় করব না। ধরা পড়লে নিজে মরব, কিন্তু দলের লোকেরা কারু নাম করব না – বল কথা রাখবে ?

সকলে সমস্বরে বলিল—রাখব।

—মায়ের কাছে বল—মা কালী, আশীর্বাদ কর আমরা যেন কাজে সমর্থ হই। সফল হলে তোমায় মা নরবলি দিয়ে পূজা করব।

সকলে হাঁ হাঁ করিয়া উঠিল—আমরা সবাই একমন—একপ্রাণ। তারপর তাহারা চারিদলে বিভক্ত হইল। তাহাদের একদল ভার লইল, যদি গ্রামবাসীরা তাহাদের তাড়া করে, তবে তাহারা সবাইকে তাড়াইয়া দিবে। একদল নিল প্রাচীর ডিঙ্গাইয়া বাড়িতে ঢুকিবার ভার। কেহ ভার নিল সদর দরজা খুলিবার।

এইভাবে সব ব্যবস্থা করিয়া তাহারা প্রস্তুত হইল ডাকাতি করিতে।

দুই

আকাশ কালো মেঘে ঢাকা। চাঁদ-তারার দর্শন মিলে না। মাঝে মাঝে মেঘের ফাঁকে ফাঁকে দুই-একটি তারা উঁকি মারে।

বাদল সারং ও নেপাল ডোমের দলের কয়েকজন লোক—লম্বা লম্বা বাঁশ ফেলিয়া মহীশূর-প্রাসাদের প্রাচীরের উপর উঠিয়া—আবার তেমনি কৌশলে বাঁশগুলি নীচে নামাইয়া দিয়া—মাটিতে নামিল। কিন্তু তাহাতে ভয়ানক বিপদ ঘটিল। সুলতান-নন্দিনীর স্বামী শাহজাদার ছিল অনেক বড় বড় বিলাতী শিকারী কুকুর। সেগুলি টের পাইয়াছিল ডাকাতদের প্রবেশ ; অমনি ঘেউ-ঘেউ করিয়া চেঁচাইতে চেঁচাইতে ডাকাতদিগকে তাড়া করিল। বিপদ গণিল ডাকাতদল। দেওয়াল টপকাইতে গিয়া বাঁশ ধরিয়া যেমন তাহারা

উঠিতে যাইবে অমনি কুকুরগুলি কাহারও পা কাহারও হাত কামড়াইয়া নিচে নামাইয়া ফেলিল। মাত্র তিনজন ডাকাত দেওয়াল টপকাইয়া পলাইতে পারিয়াছিল। ডাকাতদের ভীত ও শংকিত চিংকারে বাড়ির সকলে জাগিয়া উঠিল। কুকুরেরা কোন কোন ডাকাতের বুকের উপর বসিয়া—তাহাদের একেবারে মারিয়া ফেলিল।

যে ডাকাতেরা সদর দরজা দিয়া আসিয়া প্রবেশ করিল—তাহাদের হইল আরও দুরবস্থা। তখন কুকুরের দল রক্তের স্বাদ পাইয়া পাগলের মত ছুটাছুটি করিতেছিল। যেমন ডাকাতেরা সদর দরজা দিয়া ঢুকিয়া বাড়ির নিচের তলা হইতে সিঁড়ির পথে দ্বিতলে প্রবেশ করিতে চেষ্টা করিতেছিল, ঠিক সেই মুহূর্তে কুকুরগুলি আসিয়া এই দলের লোকদেরও আক্রমণ করিল। ডাকাতদের সাধ্য নাই যে উপরে উঠে। ওদিকে শাহজাদা জাগিয়া উঠিয়াই দোনলা বন্দুক হাতে সিঁড়ির মুখে দাঁড়াইয়া গুলি ছুঁড়িতেছিলেন। বন্দুকের ধোঁয়ায় চারিদিক অন্ধকার—চাকর-বাকর, লোকজন সকলে ঘরে ঘরে আলো জ্বালাইতেছে, পাহারাওয়ালা ডাকু আয়া হ্যায় বলিয়া চিংকার করিতেছে। সামালো সব বলিয়া বন্দুক হাতে ছুটিয়া আসিয়া পড়িয়াছে থানার লোকেরাও। ডাকাতদের হইল অতি ভীষণ সংকটময় অবস্থা। পঞ্চাশ জনের মধ্যে দশ-বারোজন ডাকাত কোন রকমে প্রাণ রক্ষা করিতে পারিয়াছিল, তাহারা ধরা পড়িল না। ঐ দলের মধ্যে ছিল নেপাল ডোম, গোপাল ডোম আর বাদল সারা প্রভৃতি নাম করা ডাকাতেরা। তাহারা কোনরকমে পলাইয়া গিয়া, পথে এক ধনী ভদ্রলোকের বাড়ি লুঠ করিতে পারিয়াছিল।

এদিকে মহীশূর প্রাসাদে যে সব ডাকাত ধরা পড়িল, তাহারা পুলিশের কাছে সব কথা প্রকাশ করিয়া দিল। কালীমায়ের কাছের প্রতিশ্রুতি ও শপথ কোথায় ভাসিয়া গেল। শাহজাদার ছোটখাটো কিছু জিনিস এই অল্প সময়ের মধ্যেই দুই-একজন ডাকাত লুঠিয়া লইয়াছিল; মারপিটের চোটে পুলিশের কাছে তাহা তাহারা ফিরাইয়া দিল এবং অন্যান্য ডাকাতির মাল কোথায় লুকাইয়া রাখিয়াছিল তাহাও বাহির করিয়া দিল।

ডাকাতেরা ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের কাছে বলিয়াছিল—হুজুর, আমরা ধরা পড়তাম না। নবাব বাড়িতে ডাকাতি করে নিশ্চিন্ত মনে চলে যেতে পারতাম। ধরা পড়লাম এই কুকুরগুলোর জন্য। ওরা আমাদের টেনে হেঁচড়ে কামড়ে কাবু করেছে !

কুকুরেরা যে প্রভুকে কত বড় ডাকাতদলের হাত হইতে রক্ষা করিয়াছিল, এইটি তাহার প্রত্যক্ষ দৃষ্টান্ত। শাহজাদার এইরূপ ভীষণ হিংস্র শিকারী কুকুর পঞ্চাশটি ছিল !*

---

* Shahazada had some very large English dogs, which would attack and kill any person who got over the wall alone.



ওড়্ গাঁয়ের ডাঙ্গা-চন্নার মাঠ

এক

বর্ধমান জেলার ওড়গাঁও গ্রাম। গুশকরা স্টেশন হইতে পশ্চিম দিকে প্রায় দেড় ক্রোশ দূরে এই ওড়গাঁও পল্লী। পল্লীর সম্মুখেই বিরাট ডাঙ্গা। উঁচু-নিচু বিশাল মাঠ, শুষ্ক কঠিন মাটি। সেই মাঠের যেন শেষ নাই! খুব দূরে দূরে পল্লী। সেই সব পল্লীতেও খুব বেশী লোক-জনের বাস নাই। যাহারা বাস করে, তাহারা দিন-দুপুরে কিংবা সন্ধ্যার পর মাঠে আসে না; কারণ, দস্যু-ডাকাতেরা এই মাঠে যাহাকে পায় তাহাকেই আক্রমণ করিয়া লুটপাট করে, সব কাড়িয়া নিয়া হত্যা করে। সামান্য জিনিসের লোভেও তাহারা হত্যা করিতে দ্বিধাবোধ করে না। লোকেরা দল বাঁধিয়া পথ চলে সতর্কভাবে। ঐ রকম মাঠ বা ডাঙ্গার মাঝে মাঝে ছোট-বড় অনেক গভীর গর্ত। সেই সব গর্তের ভিতর ডাকাতেরা লুকাইয়া থাকে। কোন রাস্তা নাই, মাঠের ভিতর দিয়া পায়ে চলা পথ। দূরে দূরে দেখা যায় তালবনের সারি। তালবনের আড়ালে রহিয়াছে ছোট-বড় পুকুর, আর আছে খেজুরগাছ—কোথাও বা দুই চারিটি আমগাছ।

ওড়গাঁও-এর ডাঙ্গা—তাহা শুধু মাঠ নয়, যেন ঢেউ-খেলানো ধূসর মরুভূমি। মাঠের কোথাও দেখিতে পাওয়া যায় না সবুজ-শ্রী। শুধু অতি দূরে—সেই বিশাল প্রান্তরের দূরপ্রান্তে যেখানে আকাশের সহিত হইয়াছে ডাঙ্গার মিলন—সেখানে দেখা যায় দুই-একখানি পল্লীর ধূসর ছায়া। জনশূন্য এই ভীষণ প্রান্তরে ডাকাতেরা যে কত লোককে খুন করিয়াছে কে জানে তাহার সংখ্যা! এই মাঠের পর

চান্না গ্রাম। সেকালে প্রবাদ প্রচলিত ছিল—যদি গেল চান্না, ঘরে উঠলো কান্না।

এই যে ডাঙ্গা, তাহার সংখ্যা তিনটি—বড় ডাঙ্গা, মাঝারি ডাঙ্গা, ছোট ডাঙ্গা। এই অঞ্চলের লোকেরা ছিল ডাকাত। তাহাদের ও অন্যান্য দস্যুদের আক্রমণ ভয়ে লোকেরা থাকিত সন্ত্রস্ত, কখন কি বিপদ ঘটে!—

এক দিনকার একটি ঘটনার কথা বলিতেছি, শোন সেই কাহিনী।

দুই

একদিন গভীর রাত্রে ওড়গাঁয়ের ডাঙ্গার পথে চান্নার মাঠ ধরিয়া চলিয়াছেন এক দীর্ঘকায়, গৌরবর্ণ, মধ্যবয়সী পথিক। পথিক ব্রাহ্মণ, শক্তি-উপাসক। ব্রাহ্মণ শিষ্যবাড়ি হইতে ফিরিতেছেন, বাস পল্লীতে। সঙ্গে সামান্য তৈজসপত্র, একটি গুড়ের কলসী আর বাম হাতে বাঁধা চাল, ডাল এবং কিছু তরিতরকারী। ব্রাহ্মণ একা নিজমনে গুন্ গুন্ করিয়া গান গাহিতে গাহিতে চলিয়াছেন। তাঁহার কাঁধে ঝুলিতেছিল ছাতা; ছাতার সঙ্গে বাঁধা ছিল লাঠি।

আকাশে তারা ফুটিয়াছে। গভীর রাত্রে কৃষ্ণপক্ষের চাঁদ উঠিয়াছে। প্রফুল্ল মনে ব্রাহ্মণ চলিতেছিলেন আর গাহিতেছিলেন—

"তোমার গলে জবাফুলের মালা,—
কে দিয়েছে তোমার গলে!
যত সমর-পথে, নেচে যেতে যেতে
রয়ে রয়ে দোলে—"

এমন সময় হা-রে-রে-রে শব্দে প্রতিধ্বনিত হইল মাঠ। ব্রাহ্মণকে আক্রমণ করিল একদল দস্যু। জ্যোৎস্নালোকে দেখা যাইতেছিল তাহাদের বলিষ্ঠ কৃষ্ণবর্ণ মূর্তি। প্রত্যেকের হাতে লাঠি ও ঠেঙ্গা—ঠেঙ্গাড়ে ডাকাতের দল।

দস্যু-সর্দার ও দলের লোকেরা ব্রাহ্মণকে ঘিরিয়া ফেলিয়া কহিল—**কে রে তুই? বড় যে ফুলের মালা গলায় ঝুলিয়ে চলছিস্ বাছাধন! সঙ্গে কি আছে, দে। নইলে এখুনি শেষ করে ফেলব।**

ব্রাহ্মণ বলিলেন—আমার সঙ্গে ত ভাই কিছুই নেই। দেখতেই পাচ্ছ কাঁধে নিয়েছি ছাতা-লাঠি, হাতে নিয়েছি গামছায় বেঁধে চালকলা আর আছে গুড়ের কলসী। নেবে ভাই—নাও।

এই বলিয়া ব্রাহ্মণ হাসিলেন হা—হা—হা! কি সরল সুন্দর হাসি!

ডাকাতেরা কহিল—একথা সবাই বলে! কোমরে থলিতে টাকা লুকিয়ে রেখেছিস্। হুম্, আমরা সব জানি রে!—তুই কে! কোন্ গাঁয়ে যাবি?

—আমি গরীব ব্রাহ্মণ। যজমানী করি, শিষ্যবাড়ি যাই, সেখানে যা পাই তা দিয়ে কোন রকমে দিন চলে। আমায় মেরে কি করবি বল! বাড়ি আমার কোটলহাটি।

—বেশ।—তা, ও কথা আমরা ঢের ঢের শুনেছি। দে কি দিবি? দে সব!

—তা' হলেই কি আমায় ছেড়ে দিবি?

—সব দিলেও তোকে মারব, না দিলেও তোকে মেরে সব কেড়েকুড়ে নিয়ে ডাঙ্গার গর্তের ভিতর ফেলে দেব। আর টুঁ-টা করতে পারবি নে।

—বেশ, তাই হবে! এই নে সব।

ব্রাহ্মণ শিষ্যবাড়িতে যে সামান্য প্রাপ্য পাইয়াছিলেন, তার সবই একে একে তুলিয়া দিলেন দস্যুদের হাতে।

সব পাইয়া দস্যু-সর্দার বলিল—তা ত হ'ল। এবার তোকে মারব, তৈরী হ! বুঝলি ও ঠাকুর, তৈরী হ!

—সব পেয়েও খুশী হলি না ভাই! গরীব বামুনের প্রাণ না নিয়ে খুশী হবি না? তবে তাই হবে, তবে একটা কথা—

কি বল্ না!—কর্কশ স্বরে বলিল দস্যু-সর্দার।

—আমি একবার মায়ের নাম করব। মায়ের নাম করা শেষ হলে মেরে ফেলিস্ আমাকে।

আচ্ছা, তাই হবে—কি বলিস্ রে!

সকলে বলিল—তাতে আর দোষ কি? আচ্ছা মায়ের নাম কর;

কিন্তু জানিস্ নাম করাও শেষ হবে, আমরাও তোকে শেষ করব—হা—হা—হা—

সকলে পাশে লাঠি-সড়কি রাখিয়া চুপ করিয়া বসিল।

ব্রাহ্মণ তাহাদের মধ্যে বসিলেন যোগাসনে। গান ধরিলেন—শ্যামা মায়ের নাম। মাতৃভক্ত—জীবন-মৃত্যু সব কথা ভুলিয়া গেলেন, সকল বিপদ-ভয়-নিবারণী শ্যামা মাকে স্মরণ করিলেন, শরণাগতপালিনী ব্যতীত কে রক্ষা করিবে তাঁহাকে? রামপ্রসাদী সুরে গান ধরিলেন—

আর কিছু নাই গো শ্যামা মা—
কেবল তোমার দুটি চরণ রাঙ্গা!
শুনি, তাও নিয়েছেন ত্রিপুরারি,
দেখে হলাম সাহস-ভাঙ্গা?
জ্ঞাতি বন্ধু সুত দারা, সুখের সময় সবাই তারা,—
বিপদ-কালে কেউ কোথাও নাই,
ঘরবাড়ি ওড়গাঁয়ের ডাঙ্গা!

ডাকাত সর্দার ব্রাহ্মণের মধুরকণ্ঠে প্রাণের বেদনায় গীত এই ভক্তিভরা প্রাণের আকুতিপূর্ণ গান শুনিয়া কহিল—ওরে ঠাকুর, তুই যে বড় আচ্ছা গানেওয়ালা—গা—গা, আরেক খানা গান শুনি! তারপর যা করবার করা যাবে।

দস্যুদল আরও কাছে আসিয়া ঘিরিয়া বসিল। তখন মাঠের চারিদিকে—প্রান্তরে প্রান্তরে জ্যোছনার ঢেউ খেলিতেছিল।

আবার গান আরম্ভ করিলেন ব্রাহ্মণ—

তোমার ভালো চিন্তা সদা
করি গো! তোমার নিকটে।
দুঃখে যাক্ সুখে যাক্ জেনেছি,
যে আছে লিখন ললাটে!
বারে বারে ভ্রমণ করি মা!
আমার এই কর্ম বটে।

কিন্তু দীন দেখে যদি দয়া কর,
তবে দীন-দয়াময়ী নামটি রটে !

দস্যু-সর্দার নীরব। তাহার দুর্দান্ত সঙ্গীরাও নীরব। ভক্তের মুখে এমন মধুর সংগীত শুনিয়া পাষাণ-হৃদয়ও গলিতে আরম্ভ করিল। সকলে সমস্বরে বলিয়া উঠিল—ঠাকুর ! ও ঠাকুর ! তুই কি দেবতা নাকি রে ? শোনা—আর একটা গান শোনা ভাই !

অমনি ভক্ত ব্রাহ্মণ গান আরম্ভ করিলেন—

মন ! চল শ্যামা মার নিকটে,
মা মোর অগতির গতি বটে।
যার যে বাসনা, মনেরি কামনা,
সেখানে সকলই ঘটে।
অল্প পুণ্য-ভরা সাজিয়ে পশরা,
এনেছে ভবের হাটে।
যা কর উপায় পাঁচে মিলি খায়,
কলঙ্ক তোমারই রটে !

গান শেষ হইল। সঙ্গে সঙ্গে দস্যু-সর্দার ও তাহার নরহত্যাকারী দস্যুদল মাতৃনামের অপূর্ব প্রেরণা-বলে যেন নূতন জীবন লাভ করিল। তাহাদের প্রাণে ফুটিয়া উঠিল ভক্তির উৎস-ধারা ! নরপশুদের হৃদয়ে জাগিল দেবতার আশিস্। তাহারা সকলে ব্রাহ্মণের পদতলে লুটাইয়া পড়িল ; কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল—ঠাকুর আমাদের ক্ষমা কর্। নে তোর এই ছাতা-লাঠি, নে তোর এই গামছা, পোটলাপুঁটলি ! নে তোর গুড়ের কলসী !

তাহাদের চোখ বাহিয়া পড়িতে লাগিল ভক্তির অশ্রুধারা ! যে নিষ্ঠুর দস্যুদল ব্রাহ্মণকে হত্যা করিবার জন্য উদ্যত হইয়াছিল, তাহারাই এখন তাঁহার চরণে পড়িয়া লুটাইতে লাগিল—কত কাঁদিল। ব্রাহ্মণের চরণে বার বার ক্ষমা ভিক্ষা করিতে লাগিল।

ব্রাহ্মণ জয় মা কালী—জয় মা কালী ! বলিয়া উচ্চকণ্ঠে ডাকিলেন শ্যামা মাকে। সঙ্গে সঙ্গে দস্যুদলও বলিতে লাগিল, জয় মা কালী—জয় মা কালী ! তাহারা ব্রাহ্মণকে তাঁহার বাসপল্লী

কোটলহাটি গ্রামে পৌঁছাইয়া দিল এবং সকলে পরদিন প্রভাতে তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিল।

সেইদিন হইতে ঐ দস্যুরা ছাড়িয়া দিল দস্যুবৃত্তি—হইল ভক্ত সাধক! চাষবাস করিয়া তাহারা জীবনযাপন করিতে লাগিল। তাহাদের বংশধরেরা এখন জীবিত আছে।

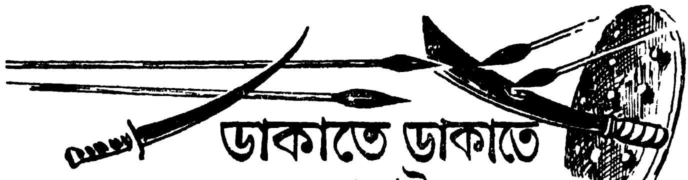
ভক্তের জয় হইল। দস্যু হইল ভক্ত। মহাপুরুষদের ভক্তি-প্রভাবে এমনি করিয়াই অসাধু হয় সাধু। পাপী হয় পুণ্যবান্।

এই ব্রাহ্মণ কে জান! ইনি হইতেছেন বাংলাদেশের একজন বিখ্যাত ভক্ত, শক্তি-সাধক মহাপুরুষ; নাম কমলাকান্ত ভট্টাচার্য। তাঁহার গান অপূর্ব। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব, রামপ্রসাদ ও কমলাকান্তের গান গাহিতে বড় ভালবাসিতেন। কমলাকান্তের একটি গান রামকৃষ্ণদেবের বড় প্রিয় ছিল; প্রায়ই সে গানটি গাহিতেন। সে গানের শেষ চরণ হইতেছে—

আদর করে হৃদে রাখ, আদরিণী শ্যামা মাকে।
তুমি ছ্যাখ আমি দেখি,
আর যেন ভাই কেউ না দেখে!.....

সাধক কবি কমলাকান্ত আনুমানিক ১৮০৮ খৃষ্টাব্দে বর্ধমান জেলার অম্বিকা-কালনা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। সেখান হইতে বর্ধমানে আসিয়া বাস করেন। ইনি শক্তি-সাধক, বিদ্বান্ ও সুকবি ছিলেন। বর্ধমানের মহারাজা তেজেশচন্দ্র ইঁহার সদ্গুণে বিমোহিত হইয়া ইঁহাকে সভাপণ্ডিত ও গুরুপদে বরণ করেন; বর্ধমান জেলার কোটলহাটি গ্রামে রাজা তাঁহাকে প্রতিষ্ঠিত করেন। সম্ভবতঃ ১২৭৭ সালের শেষভাগে তাঁহার মৃত্যু হয়।

কমলাকান্তের রচিত বহু সংগীত কালনার সর্বত্র এক সময়ে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। এখনও তাহা লুপ্ত হয় নাই। ওড়গাঁয়ের ডাঙ্গার বিশাল প্রান্তরে যেখানে দস্যুদল কমলাকান্তকে আক্রমণ করিয়াছিল, এখনও গ্রামবাসীরা সেই স্থান দেখাইয়া পরম গৌরব বোধ করে।



ডাকাতে ডাকাতে লড়াই

এক

সে প্রায় একশত বৎসর আগের কথা। হুগলী জেলার বিখ্যাত পাণ্ডুয়া গ্রামে ছিলেন এক ব্রাহ্মণ জমিদার। গ্রামে অনেক লোকের বাস। বেশির ভাগই ব্রাহ্মণ, কায়স্থ। তাহা ছাড়া বাগ্দী, অন্যান্য কৃষিজীবী হিন্দু এবং মুসলমানও ছিল। সেই সময়ে প্রত্যেক ভদ্র ও সংগতিশালী ব্যক্তিকে সর্বদা সতর্ক থাকিতে হইত। তখন ইংরাজ-শাসন বদ্ধমূল হইলেও চোর-ডাকাতের উপদ্রব ছিল খুবই বেশী। পাণ্ডুয়াতে একটি থানা ছিল, তবু স্থানীয় লোকদের নিরাপদ ভাবে বসবাস করিবার উপায় ছিল না। প্রায়ই ডাকাতি হইত ভীষণভাবে।

সেকালে চন্দননগর, হুগলী ও বর্ধমানের ডাকাতের দল অদ্ভুত কৌশলের সহিত ডাকাতি করিত। পুলিশ কিছুই করিতে পারিত না।* ডাকাতেরা নির্বিঘ্নে লুঠ করিয়া চলিয়া যাইত। সেকালে ডাকাতেরা এমন দুর্ধর্ষ ছিল যে, তাহারা যে বাড়িতে ডাকাতি করিতে যাইবে, সেই বাড়িতে পূর্বেই পত্র দিয়া জানাইয়া দিত কিংবা কোন লোক দিয়া কৌশলে সংবাদ দিত। এমনও দেখা গিয়াছে যে, অতিথির বেশে কিংবা সন্ন্যাসী বা ফকিরের বেশে আসিয়া ডাকাতেরা গৃহস্থের যথাসর্বস্ব লুণ্ঠন করিয়াছে। ঐ সময়ে ভদ্র ও সম্ভ্রান্ত ধনী ব্যক্তিরা ভয়ে ভয়ে দিন কাটাইতেন। থানায় দারোগা ও পুলিশ থাকিত বটে, কিন্তু তাহারা দুর্দান্ত দস্যুদের সঙ্গে কোনরূপেই আঁটিয়া উঠিতে পারিত না।

---

* সরকারী রিপোর্টে আছে—The Hooghly and Burdwan Police unable to effect them……As in the Pandooah Thana, they are unsuccessful.

পাণ্ডুয়া গ্রামের জমিদারের নাম ছিল পতিতপাবন বন্দ্যোপাধ্যায়, বিশেষ সম্ভ্রান্ত এবং সম্পত্তিশালী লোক। জমিদার মহাশয়ের বয়স পঞ্চাশের কাছাকাছি; গায়ের রং উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ। বেঁটে মানুষ, হাড়ে-মাসে গড়া মজবুত শরীর। প্রজাদের প্রিয় জমিদার। প্রজাদের তিনি সত্য সত্যই সন্তানের মত ভালবাসিতেন। ম্যালেরিয়া, ওলাউঠা, বসন্ত রোগ প্রায়ই গ্রামে সংক্রামক আকারে দেখা দিত। সে-সময়ে তিনি তাহাদের চিকিৎসার ব্যবস্থা করিতেন; অন্নহীনে অন্নদান, দুর্ভিক্ষের সময় নিজের গোলাজাত শস্য হইতে ধান চাউল ইত্যাদি দান করিতেন। সরকারের কাছেও তাঁহার বেশ সুনাম ছিল। প্রতিদিন প্রাতঃকালে তিনি দরবারে বসিতেন।

পূজার কিছুদিন পরের কথা। পতিতপাবন বাবু কাছারিতে বসিয়া আছেন। বিস্তৃত ফরাস বিছানো, তাহার উপর ছোট একখানা গদি—ধব্‌ধবে পরিষ্কার, পাশে তিন-চারটি তাকিয়া। পতিতপাবন বাবু আলবোলা টানিতেছেন এবং নায়েব, জমানবিস, সুমারনবিস ও মুহুরীদের সঙ্গে গল্প করিতেছেন—চাষবাসের কথা, ফসলের কথা, সামাজিক, বৈষয়িক ও স্বাস্থ্যের কথা। এমন সময় একটি লোক আসিয়া তাঁহাকে একখানি চিঠি দিয়া মুহূর্ত মধ্যে চলিয়া গেল। লোকটার দিকে নজর রাখিবার সুযোগ কেহ পাইল না।

পতিতপাবন বাবু চিঠিখানি পড়িয়া বিষণ্ণ হইয়া পড়িলেন। তাঁহার পাশে বসিয়াছিলেন তাঁহার একান্ত বিশ্বাসী নায়েব হরলাল ঘোষ। পাশের গ্রামেই তাঁহার বাড়ি। প্রকৃতপক্ষে হরলাল ঘোষই পতিতপাবন বাবুর জমিদারীর শাসন-সংরক্ষণ, দেখাশুনা সবই করেন। ওদিকে সেকালের কলিকাতা মেডিকেল কলেজের একজন কৃতী ছাত্র ছিলেন তিনি—রোগীদের ঔষধ-পথ্য দিয়া প্রায়ই সাহায্য করিতেন। দীর্ঘকায় বলিষ্ঠ মানুষ। চোখে মুখে তাঁহার প্রতিভার দ্যুতি।

পতিতপাবন বাবু পত্রখানি পড়িয়া হরলাল বাবুর হাতে দিলেন। হরলাল বাবু দুই-তিনবার পত্রখানি পড়িয়া একটু চিন্তিত হইয়া পড়িলেন, তারপর পতিতপাবন বাবুকে বলিলেন—আপনি আজকের মত কাছারি ভেঙ্গে চলুন আমার সাথে—একটু গোপন কথা আছে।

তাঁহারা দুই জনে বাড়ি হইতে অনেকটা দূরে একটি ছোট পুকুরের কাছে আসিয়া হরলাল বাবু ডাকিলেন—নবীনদা, বাড়ি আছ ?

উত্তর আসিল—আছি, কে তুমি ?

ঃ আমি হরলাল, সঙ্গে আছেন কর্তাবাবু।

ঃ আরে কি বরাত—কি বরাত !…বলিয়া একজন পঁয়ত্রিশ-ছত্রিশ বৎসর বয়স্ক লোক বাহিরে আসিল। লোকটার কি ভীষণ চেহারা—দেখিলেই ভয় হয়। শ্যামবর্ণ দীর্ঘকায়, হাত-পায়ের পেশী স্ফীত, মনে হয় যেন লোহার তৈয়ারী, চক্ষু দুইটি জ্বলন্ত। বাহির হইয়া আসিয়া দুই জনকে প্রণাম করিয়া নবীন বলিল—কর্তা-মশায়ের পায়ের ধুলো পড়ে আমার এ-মাটি সোনার মাটি হয়ে গেল।

পতিতপাবন বাবু বলিলেন—নবীন, আমার বড় বিপদ।

নবীন কহিল—তোমার আবার বিপদ কি কর্তা !

হরলাল বাবু বলিলেন—তুমি এক্ষুণি এস আমাদের সাথে।

নবীন পলক মধ্যে লাঠি হাতে তাঁহাদের সঙ্গে চলিয়া আসিল।

দুই

নবীন বলিল—'এই কথা ! কোন ভয় নেই। নবীন বাগ্দীর হাতে লাঠি থাকতে কারো সাধ্য নেই যে, এ বাড়ি লুঠ করে। আপনি কাকেও কোন কথা না বলে, মা-ঠাকরুণদের ও ছেলেমেয়েদের নিয়ে হরে ভাইয়ের বাড়ি চলে যান। সাবধান, কাকেও কিছু বলবেন না।' একটু ভাবিয়া কহিল—'না হয় আমিই আপনাদের পৌঁছে দেব।'

এই বলিয়া সে বাড়ির চারিদিক মায় অন্দর-মহল পর্যন্ত সব ঘুরিয়া আসিয়া কহিল— আমি সব লোকজন ঠিক করে ফেলি।

পতিতপাবন বাবু কহিলেন—নবীন ভাই, আমি বাড়ি ছেড়ে যাব না। যদি এমন কিছু হয় তবে আমার বন্দুক আছে, গুলি চালাব।

নবীন বলিল—কর্তামশাই, কিছু করতে হবে না। আপনি মাঝের ঘরে মা-ঠাকরুণদের নিয়ে থাকুন। আমি নিজে আপনার দোরের কাছে পাহারা দেব।

নবীন যাইবার সময় কহিল—বাবু! কাছারির পাইক, বরকন্দাজ

যারা আছে তাদের সকলকেও লাঠি-বল্লম, দা-কুড়ুল, টাঙি-তলোয়ার যা কিছু আছে সব নিয়ে তৈরী থাকতে বলবেন।

হরলাল বাবু সব ব্যবস্থা করিতে বাহির হইলেন। পতিতপাবন বাবুকে বলিয়া গেলেন—আপনি নিশ্চিন্ত মনে আহার ও বিশ্রাম করুন। কিছু ভাববেন না।

নবীন বাগ্দী ছিল একজন কুখ্যাত ডাকাত! সে ছিল দলের সর্দার। তখনও সে-ই সর্দার। পতিতপাবন বাবু তাহাকে জমি-জিরাত ঘর বাড়ি করিয়া দিয়াছেন। এখন সে চাষবাস করে, ক্ষেত-খামার দেখে। তবে সে যে একেবারে ডাকাতি ছাড়িয়াছে একথা কেহ বিশ্বাস করে না। এক সময়ে সে ছিল সর্দার ডাকাত। পতিতপাবন বাবুর প্রতি ছিল তাহার ভক্তি ও শ্রদ্ধা। তাহার দাপটে পাণ্ডুয়ার কোন বাড়িতেই বড় একটা চুরি-ডাকাতি হইত না। এই কারণে ডাকাত জানিয়াও গ্রামের ছেলে বুড়ো সকলে তাহাকে ভাল-বাসিত। এদিকে তাহার ব্যবহার ছিল অতি মধুর। প্রতিদিন তাহার বাড়িতে পুরোনো বন্ধু-ডাকাতদের সঙ্গে তাহার আড্ডা বসিত—সে এই আড্ডার মায়া তখনও ছাড়িতে পারে নাই।

সে দিন আবার একটা হাতিয়ার ধরার সুযোগ পাইয়া নবীন উৎফুল্ল হইয়া উঠিল এবং একে একে কেফাতুল্লা, রাজু বৈরাগী, গোপাল ডোম প্রভৃতিকে সংবাদ দিয়া আনিয়া বলিল—ভাই, আমার বাবুর বাড়ি ডাকাতি হবে বলে চিঠি এসেছে। বাবুকে বাঁচাতেই হবে। তোমরা দলে-বলে আমার এখানে এস। জং পড়া তলোয়ারটা আবার রক্ত খেয়ে তাজা হয়ে উঠুক।

তাহার বন্ধু ডাকাতরা রাজী হইয়া সমবেত কণ্ঠে কহিল—'হাঁ, আমরা সকলে আসব তোমার বাড়ি। তারপর হুকুম মত কাজ করব।'

নবীন নিশ্চিন্ত হইল—রাত্রির জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিল।

তিন

রাত্রি হইয়াছে। পল্লী নিস্তব্ধ। বাড়ির কাহারও কোন সাড়া শব্দ নাই, সকলেই নিদ্রামগ্ন। জমিদার-বাড়ির পশ্চিম দিকের

দেওয়ালের পাশে ছিল একটা বিশাল বটগাছ। উহার শাখা-প্রশাখা চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। তার পরেই বাগান। বাগানে নানা জাতির গাছ ডালে ডালে পাতায় পাতায় মিলিয়া গিয়াছে। গাছের নিচে অন্ধকার। রাত্রে ত দূরের কথা, দিনের বেলাও সেখানে ভাল করিয়া কিছু দেখা যায় না! বাগানের পাশ দিয়া একটি শীর্ণকায় খাল বহিয়া চলিয়াছে ঝির্ ঝির্ করিয়া। তাহার পাড়েই শ্মশান।

ক্রমে রাত্রি দ্বিপ্রহর হইল চন্দ্র অস্ত গিয়াছে। আকাশে ফাঁকা-ফাঁকা মেঘ! ডাকাতেরা এইবার মশাল জ্বালিয়া তাহাদের দলের সর্দার গৌর লিজারির হুকুমে জয় মা কালী আর হা-রে-রে-রে শব্দে চারিদিক মুখরিত করিয়া বটগাছের শাখা ধরিয়া বাড়ির ছাদের উপর উঠিতে শুরু করিল। তাহারা ঘন ঘন চিৎকার করিতে লাগিল। তাহাদের বীভৎস চিৎকার গ্রামের চারিদিকে প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল। এদিকে নবীন ও তাহার দলের লোকেরা বাড়ির চারিদিকে সারি বাঁধিয়া ডাকাতদের কীর্তি-কলাপ লক্ষ্য করিতেছিল। যেমন একজন ডাকাত আসিয়া ছাদে লাফাইয়া পড়িতেছিল অমনি নবীন ও তাহার দলের লোকেরা পাল্টা জবাব দিতেছিল হা-রে-রে-রে করিয়া।

দুই পক্ষেরই মশাল জ্বলিয়া উঠিয়াছিল। ওদিকে কয়েক জন ডাকাত খিড়কির দরজা ভাঙ্গিয়া অন্দরে প্রবেশ করিয়া হৈ-হল্লা করিতেছিল, আর কয়েক জন বাহিরের দরজা ভাঙ্গিয়া বাড়ির ভিতরে ঢুকিবার চেষ্টা করিতেছিল। এইবার নবীন বাঁশী বাজাইল।

সঙ্গে সঙ্গে আরম্ভ হইল ভীষণ লড়াই—হাতাহাতি, লাঠালাঠি। সড়কি ও বল্লমের আঘাতে দুই পক্ষের লোকই আহত হইতে লাগিল। নবীনের দলে কম লোক হইলেও তাহাদের উন্নত অস্ত্র-পরিচালনার কৌশলে ছাদের পথ দিয়া যে-সব ডাকাত আসিয়াছিল, তাহাদের প্রায় সকলেই লাঠির ঘায়ে হাঁটুভাঙ্গা 'দ' হইয়া পড়িয়াছিল।

বাহিরে কেফাতুল্লা, রাজু বৈরাগী এবং গোপাল ডোমের ভীষণ আক্রমণে ডাকাতদের অনেকেই আহত অবস্থায় কাছারির বাহিরে বিরাট মাঠের মধ্যে বিক্ষিপ্ত ও বিচ্ছিন্ন ভাবে পড়িয়া রহিল।

ডাকাতেরা দুই ঘণ্টার মধ্যেই হার মানিয়া পলাইতে শুরু করিল। এমনকি তাহারা মৃত ও আহত সঙ্গীদিগকে সরাইয়া লইবার সুযোগও পাইল না। অতি অল্প সময়ের মধ্যেই বাড়ি শান্ত হইয়া গেল। জমিদার বাড়ির ঘরে ঘরে আলো জ্বলিয়া উঠিল।

পরদিন সকালবেলা গ্রামের লোকের মুখে মুখে ডাকাতির কথা এবং নবীনের প্রশংসা হাটে ঘাটে প্রচারিত হইয়া পড়িল। থানার দারোগা ও পুলিশ দল আসিল—মৃত ও আহত ব্যক্তিদের তাহারা সদরে চালান দিল।

এই ডাকাতদল বিভিন্ন সময়ে যে কত স্থানে ডাকাতি করিয়াছে তাহার সংবাদও পাওয়া গেল এবং আরও অনেকে ধরা পড়িল। সরকারী বিবরণীতে এই ডাকাতদের বলা হইয়াছে 'চন্দননগরের গ্যাঙ্গ'—চন্দননগরের ডাকাতদল।*

পতিতপাবন বাবু নবীনকে প্রচুর পুরস্কার দিয়াছিলেন। এই ঘটনার পর নবীন সম্পূর্ণরূপে ডাকাতি ছাড়িয়া দিয়াছিল।

---

*সরকারী বিবরণীতে বর্ণিত হইয়াছে—এইরূপ দুঃসাহসিক ডাকাতি এবং ডাকাতদের সঙ্গে লড়াই করিয়া তাহাদিগকে তাড়াইয়া দিতে গ্রামবাসীদিগকে বড় একটা দেখা যায় না, পাণ্ডুয়ার এ ডাকাতিতে তাহা দেখা গেল।

চন্দননগরের ডাকাতদলের সম্বন্ধে সরকারী বিবরণীতে এইরূপ লেখা আছে: "The French settlement of Chandernagore is now swarming with dacoits driven from Calcutta, or the remnants of Mofussail gangs. From the French territory they sally out and commit depredations in the neighbouring districts. They are perfectly safe, because, having for the most part assumed false names. I cannot call on the French authorities to deliver them up, neither can any people follow them into the foreign territory to discover their places of concealment.—Suppression of Dacoity in Bengal 1854.



ডাকাত ও নৌকাডুবি

এক

কলিকাতার শ্যামবাজার হইতে যে রাস্তাটি বনগাঁ হইয়া খুলনা পর্যন্ত গিয়াছে, সেই রাস্তা এখন প্রশস্ত সুন্দর এবং দিনরাত্র উহার উপর দিয়া বাস ও মোটর গাড়ি চলে। খুলনা পর্যন্ত রেলগাড়িও যায়। কাজেই সর্বদা ঐ রাস্তায় লোক সমাগম দেখিতে পাওয়া যায়।

প্রায় দুই শত বৎসর আগে এই পথ ছিল ভীষণ বনাকীর্ণ। পথের দুই ধারে মাঠ। সেই সব মাঠ যেন একেবারে তেপান্তরের মাঠ। এই পথে লোকজন চলিত শহরে, বন্দরে, গঞ্জে। পথের পাশে ছিল ছোট ছোট চটি। ঘন-বনের আড়ালে বাস করিত দলে দলে ডাকাত। পথিকেরা নিরাপদে পথ চলিতে পারিত না। আজ যেখানে গৌরীপুরের হাট বসে তাহারই অল্প দূরে গৌরীপুর এবং আরও কয়েকটি ছোট-বড় পল্লীতে ছিল ডাকাতের বসতি। তাহার একটি পল্লীতে বাস করিত মাণিক ঘোষ। সে ছিল ঐ অঞ্চলের সর্দার ডাকাত।

মাণিক কাছাকাছি স্থানে বড় একটা ডাকাতি করিত না, দূরে দূরে ডাকাতি করিত। দলে তাহার অনেক লোক ছিল! ধরা পড়িলেও তাহাদের ঠিকানা মিলিত না। তাহারা নিজেদের বিভিন্ন নামে পরিচয় দিত এজন্য তাহাদের ঠিকানা জানা যাইত না। অদ্ভুত ক্ষমতাশালী ছিল মাণিক ঘোষের দল—কেরামদ্দী লিকারী ছিল তাহার দলের একজন নামকরা ডাকাত।

কেরামদ্দী এবং মাণিক ঘোষ দুইজনে বহু দূর দেশান্তরে ডাকাতি করিতে যাইত। বিভিন্ন নদী-নালা পার হইয়া নদীয়ার সীমান্ত হইতে সুন্দরবনের সীমানা পর্যন্ত, অপর দিকে যশোহরের সীমান্ত হইতে

রাসতের পশ্চিমে গোবরডাঙ্গা, কাগজপুকুরিয়া, লুবশা প্রভৃতি গ্রামে তাহারা ডাকাতি করিত। কখনও সফল হইত, কখনও হইত না।

এখানে একটা কথা শুনিলে সেকালের জমিদার ও তালুকদারদের চরিত্র সম্বন্ধে অনেক কথা জানা যায়। দেশের জমিদারেরা ও তালুকদারেরা নিজেদের আত্মীয়-স্বজন কিংবা প্রতিবেশী জমিদারের সহিত বিবাদ বাধিলে আত্মরক্ষা করিবার জন্য কেরামদ্দী ও মাণিক ঘোষকে ডাকিতেন। সেই অঞ্চলের চোর, দস্যু, দুশ্চরিত্র লোক—যে জাতিরই হউক না কেন—তাহাদের আহ্বানে আসিয়া মিলিত হইত। মাণিক ঘোষ ও কেরামদ্দীর দলে হিন্দু, মুসলমান সব জাতির লোক ছিল।

আর একদল ডাকাত ছিল বারাসতের নিকটবর্তী কদমগাছি থানার অন্তর্গত একটি পল্লীতে। একজন ধনী মুসলমান ছিল সেই দলের নেতা। সেই ডাকাতদলকে ধরিতে বা সাজা দিতে দারোগা পুলিশ দূরের কথা, ম্যাজিস্ট্রেটও পারিতেন না। এমনি কৌশলী ও সুচতুর ছিল তাহারা। কিন্তু একবার ঘটিল এক আশ্চর্য ঘটনা—সে-কাহিনীই বলিতেছি।

কেরামদ্দী ও মাণিক শুনিয়াছিল যে, সুখসাগরের পথে এক ধনী ব্যক্তি তাঁহার বাড়ির দিকে চলিয়াছেন। সঙ্গে আছে তাঁহার স্ত্রী, কন্যা, একটি ছোট ছেলে এবং একজন মাত্র ভৃত্য। প্রচুর টাকা-পয়সা লইয়া চলিয়াছেন তিনি। অগ্রহায়ণ মাসে ধনী ব্যক্তির বাড়িতে তাঁহার মেয়ের বিবাহ হইবে। সুখসাগরের কাছেই তাঁহার বাস-পল্লী। সুখসাগর হইতে একটি ছোট খালের মধ্য দিয়া যাইতে হয় তাঁহাদের গ্রামে! দলের লোকেরা পূর্বেই এই সংবাদ সংগ্রহ করিয়া মাণিক ঘোষকে জানাইয়াছিল। সংবাদ পাইয়া মাণিক ঘোষ গেল সুখসাগরের দিকে—কেরামদ্দী চলিল শান্তিপুরের দিকে। প্রত্যেকের দলেই ছিল কুড়ি-পঁচিশজন করিয়া লোক।

দুই

ধনী ভদ্রলোকের নাম শ্যামাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি কলিকাতা হইতে বাড়ি চলিয়াছেন। পূর্বেই বলা হইয়াছে যে,

ভদ্রলোকের মেয়ের বিবাহ অগ্রহায়ণ মাসে। বিধি-ব্যবস্থা করিতেও সময় লাগিবে। এজন্যই তিনি দুই মাস আগেই চলিয়াছেন।

আশ্বিন মাস। নদীর জল কানায় কানায় পূর্ণ। ভাগীরথীর বুক দিয়া চলিয়াছে নৌকা। নৌকায় আছে তাঁহার ভৃত্য, একথাও আগেই বলিয়াছি ভৃত্যটি ছিল খুবই বিশ্বাসী, তাহার নাম কানাই। কানাইয়ের বয়স পঞ্চাশের কাছাকাছি। গলায় রুদ্রাক্ষের মালা, বুক প্রশস্ত, হাত-পা গোলগাল এবং পেশীবহুল শক্তিশালী পুরুষ। সে নৌকার একধারে বসিয়া মাঝিদের সঙ্গে গল্প করিতেছিল। কর্তা ও গৃহিণী ভিতরে বসিয়া গল্প এবং হাস্য-কৌতুক করিতেছিলেন। তাঁহাদের সঙ্গে জিনিসপত্র নেহাৎ কম ছিল না ; কারণ অনেক দিন পরে বাড়িতে গিয়া প্রথমেই ত জিনিসপত্র মিলিবে না, তাই আবশ্যকীয় সব জিনিসপত্র সঙ্গে লইয়াছিলেন।

সুখসাগরের কাছে আসিতেই মাঝি বলিল—'কর্তা, তাড়াতাড়ি এ জায়গা পার হয়ে খালের পাড়ে যে হাট আছে সেখানে গিয়ে নৌকা বাঁধব। জানেন কর্তা, এখানে বড় ডাকাতের ভয়। আমাদের ত কিছু নেই, কিন্তু আপনি দাদাঠাকুর টাকা-কড়ি নিয়ে মেয়ের বিয়ে দিতে বাড়ি যাচ্ছেন। যদি ডাকাত পড়ে তা'হলে যে আর রক্ষা নেই। তাই আপনাকে পূর্ব থেকেই সাবধান করে দিচ্ছি। সুখসাগরটা তাড়াতাড়ি ছেড়ে গিয়ে গঞ্জের হাটে পৌছতে পারলেই হ'ল।'

কর্তা বলিলেন—'সুখসাগর প্রসিদ্ধ স্থান। এখানে অনেক বড় বড় বাড়ি, সাহেবের কুঠি, থানা আছে। এক কাজ কর, রাত্রিটা এখানে থেকে কাল সকালে আমরা বাড়ির দিকে যাব।'

মাঝিরা আর একটি কথাও বলিল না।

আমরা যে সময়ের কথা বলিতেছি, সে সময়ে সুখসাগরের কাছাকাছি প্রত্যেকটি গ্রামেই ছিল ডাকাতের ভয়। দিনে হউক, রাত্রিতে হউক, নৌকায় চলাচল করা ছিল খুবই বিপজ্জনক। ডাকাতেরা আসিয়া লুঠপাট করিয়া লইত, কখনও বা নৌকারোহীদের প্রাণে মারিয়া ফেলিত। মাঝিরা এই সব কথা জানিত বলিয়া শ্যামাচরণ বাবুকে সতর্ক করিয়া দিয়াছিল, কিন্তু তিনি তাহা শুনিলেন

না। কহিলেন—'বাপু, যাই বল না কেন, আমরা রাত জেগে পাহারা দেব, ডাকাত আমাদের কি করবে?

কাজেই সুখসাগরের কাছাকাছি কোন স্থানে নৌকা নোঙ্গর করিবার ব্যবস্থা হইল।

তিন

নৌকা চলিতেছে। দূর হইতে সুখসাগরের দালান-কোঠা দেখা যাইতেছে। এমন সময় আকাশ মেঘে ঢাকিয়া ফেলিল। রাত্রির মারম্ভেই ঘন বর্ষণ আরম্ভ হইল। ভাগীরথীর বুকে উঠিল প্রবল ঢেউ। সোঁ-সোঁ সাঁই-সাঁই শব্দে প্রবলবেগে ঝড় বহিতে লাগিল। ঢেউয়ে নৌকা তুলিতে লাগিল। প্রাণপণ চেষ্টা করিয়াও মাঝিরা নৌকা ঠিক রাখিতে পারিল না। একেবারে ঘাটের কাছে আসিয়া হইল নৌকাডুবি। ঘোর অন্ধকারের রাত্রিতে ঝড়-ঝঞ্ঝার ভিতর নিমেষ মধ্যে নৌকা ডুবিয়া গেল। মাঝিমাল্লারা কেহ কেহ তীরে ঝাঁপাইয়া পড়িল। হায় হায় করিবারও কেহ রহিল না।

এমনি সময়ে সেই ঘনঘোর অন্ধকার রাত্রিতে একদল লোক নদীতে ঝাঁপাইয়া পড়িল এবং বিশ-পঁচিশ জন লোক অসীম বিক্রমে টানিয়া তুলিল নৌকা। তাহারা আরোহীদের পারে টানিয়া লইয়া তড়িৎগতিতে মশাল জ্বালিল এবং নিকটবর্তী দোকানীর চালাঘরে লইয়া গেল। তাহাদেরই একজন ছুটিয়া গিয়া পরিচিত এক পাদ্রী-সাহেবকে ডাকিয়া আনিল।

পাদ্রীসাহেব ছিলেন একজন বিচক্ষণ চিকিৎসক। তাঁহার চিকিৎসা ও শুশ্রূষার গুণে সকলেরই জ্ঞান হইল। পরে সাহেব ও তাঁহার অনুচরগণ নৌকার লোকদের সাহেবের বাসগৃহে লইয়া গেল। সকলের চেষ্টায় ও যত্নে পরদিন নৌকারোহীরা বেশ সুস্থ হইয়া উঠিল।

কে ইহারা, যাহারা নৌকারোহীদের উদ্ধার করিল? শোন!

উদ্ধার করিয়াছিল ডাকাত মাণিক ঘোষের দল। তাহারা বহুদূর হইতে শ্যামাচরণ বাবুর নৌকাখানির অনুসরণ করিয়া আসিতেছিল। যখন তাহারা দেখিতে পাইল নৌকাখানি তীরে ভিড়িবার সময়

আকস্মিক ঝড়ের ঝাপ্‌টায় পড়িয়া নদীর কিনারায় আসিয়া ডুবিয়া গেল, তখন তাহারা ডাকাতির কথা ভুলিল, হিংসা ভুলিল, ভুলিল নৃশংস নরহত্যার কথা। তখন তাহারা নিমেষ মধ্যে ঝাঁপাইয়া পড়িল খরস্রোতা ভাগীরথীর বুকে। ভাগ্যক্রমে নৌকাখানি তুলিয়া তাহারা সকলকে উদ্ধার করিল এবং জীবন রক্ষা পাইল আরোহীদের সকলের। এমন কি ডাকাতেরা টাকার বাক্সটি পর্যন্ত খুঁজিয়া পাইয়া দিয়াছিল মালিকের হাতে।

দুই দিন পর শ্যামাচরণ বাবু, তাঁহার স্ত্রী, পুত্র ও কন্যা সুস্থ ও সবল হইলেন। শ্যামাচরণ বাবু জিজ্ঞাসা করিলেন সাহেবকে—আমাদের প্রাণরক্ষা করিলেন কে?

পাদ্রীসাহেব উদ্ধারকারীদের কথা জানাইয়া কহিলেন—মহাশয়, পাপকে ঘৃণা করিবেন, কিন্তু পাপীকে ঘৃণা করিবেন না। লোকের অপরাধ ক্ষমা করিবেন, আপনাদের অপরাধও ঈশ্বর ক্ষমা করিবেন।

পরদিন সকালে আসিল মাণিক ঘোষ।

পাদ্রীসাহেব বলিলেন--মাণিক, হামি জানি টুমি ডাকাত, কিন্তু টুমি যে মহট কাজ করিয়াছ সেজন্য ঈশ্বর তোমাকে ক্ষমা করিবেন!

মাণিক আসিলে শ্যামাচরণ বাবু ও তাঁহার স্ত্রী কাঁদিয়া ফেলিলেন, বলিলেন—'বাবা, তুমিই আমাদের প্রাণ বাঁচিয়েছ!'

মাণিক ঘোষ একটি কথাও বলিল না। সেও কাঁদিয়া ফেলিল।

সেদিন সেই মুহূর্তে মাণিক ঘোষের মনে আসিল অপূর্ব পরিবর্তন। সে ডাকাতি ছাড়িয়া দিল। ম্যাজিস্ট্রেট তাহাকে ধরিয়া চালান দিয়াছিলেন; কিন্তু জজ তাহার বিরুদ্ধে কোন প্রমাণ না পাইয়া তাহাকে ছাড়িয়া দিলেন।

শ্যামাচরণ বাবু কন্যার বিবাহে মাণিক ঘোষের দলের সকলকে নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। তাহারাও নিমন্ত্রণে যোগদানের পরে আনন্দিত মনে দেশে ফিরিয়া গেল।

আমরা সরকারী কাগজপত্র হইতে জানিতে পারি, শেষ-জীবনে মাণিক ঘোষ সৎভাবে জীবন যাপন করিয়াছিল।

সমাপ্ত